ছাপ্পান্ন ইঞ্চি বনাম কামিয়ে নেওয়াদের জোট
— পৃঃ ১২

স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

গোমাংস ও গবাদিপশু নিষিদ্ধকরণ ও সেকুলার নাটক
—পৃঃ ১৪

৬৯ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা।। ১৯ জুন ২০১৭।। ৪ আষাঢ় - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

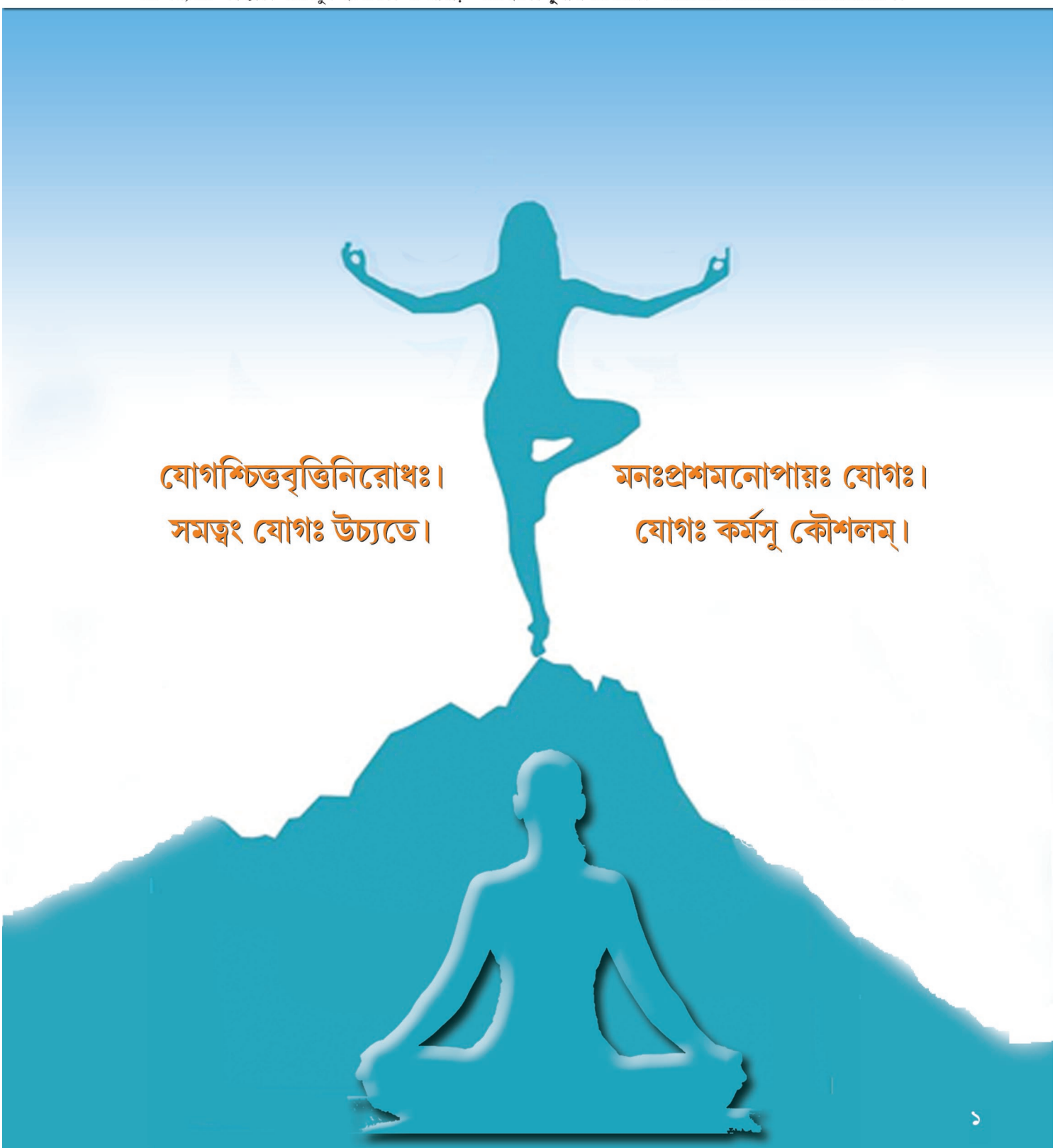

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ৪১ সংখ্যা, ৪ আষাঢ়, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

১৯ জুন - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

মমতার অপরিণামদর্শিতাই পাহাড়ে আগুন জ্বালিয়েছে
▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : কেন দিদি কাঁদালে এমন
▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

ছাপ্পান্ন ইঞ্চি বনাম কামিয়ে নেওয়াদের জোট
▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ১২

গোমাংস ও গবাদি পশু নিষিদ্ধকরণ ও সেকুলার নাটক
▯ অর্ণব কুমার ব্যানার্জী ▯ ১৪

চীনা যজ্ঞে ভারতের অভিষেক
▯ প্রণয় রায় ▯ ১৬

যোগদর্শন বিশ্বমানবের দর্শন ▯ ডা: দিব্যসুন্দর দাস ▯ ১৯

সাক্ষাৎকার : জীবন ও সমাজের মেলবন্ধন করে যোগ
▯ সুবল ঘোষ ▯ ২১

ভারতীয় যোগের সফলতম দূত নরেন্দ্র মোদী ও বাবা রামদেব : যোগের জয়গানে মুখরিত বিশ্ব ▯ চন্দ্রভানু ঘোষাল ▯ ২২

বিগত তিনবছর ভারতব্যাপী শুরু হয়েছে মফস্সল শহরগুলির এক নবজাগরণ ▯ বেঙ্কাইয়া নাইডু ▯ ২৭

পশ্চিমবঙ্গের পুনর্নির্মাণ ▯ ভক্তিপ্রসাদ অধিকারী ▯ ৩০

প্রভু জগন্নাথের জ্বর ▯ উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল ▯ ৩১

মহাভারতের নারী : বিদুরপত্নী দেবিকা
▯ দেবপ্রসাদ মজুমদার ▯ ৩৩

দ্রিঘাংশুর ভূয়োদর্শন : হলদে সবুজ ওরাং ওটাং ▯ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ ▯ চিঠিপত্র : ২৯ ▯ অঙ্গনা : ৩৪ ▯ সুস্বাস্থ্য: ৩৭ ▯ অন্যরকম : ৩৮ ▯ রঙ্গম : ৩৯ ▯ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১

স্বস্তিকা

শ্যামাপ্রসাদ বিশেষ সংখ্যা

প্রকাশিত হবে ৩ জুলাই, ২০১৭

ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মবলিদানের পর প্রতিবছর স্বস্তিকা শ্যামাপ্রসাদ সংখ্যা প্রকাশ করে চলেছে। শ্যামাপ্রসাদ-চর্চার ক্ষেত্রে এ এক অনন্য নজির। এ বছরও তার ব্যতিক্রম নয়। শ্যামাপ্রসাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে এই সংখ্যায় আলোচনা করবেন মানস ঘোষ, রন্তিদেব সেনগুপ্ত, মোহিত রায়, অভিজিৎ দাশগুপ্ত প্রমুখ। সংরক্ষণযোগ্য এই সংখ্যাটি অগ্রিম বুকিং করুন।

।। দাম একই থাকছে— ১০.০০ টাকা।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই

ব্যবহার করুন

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

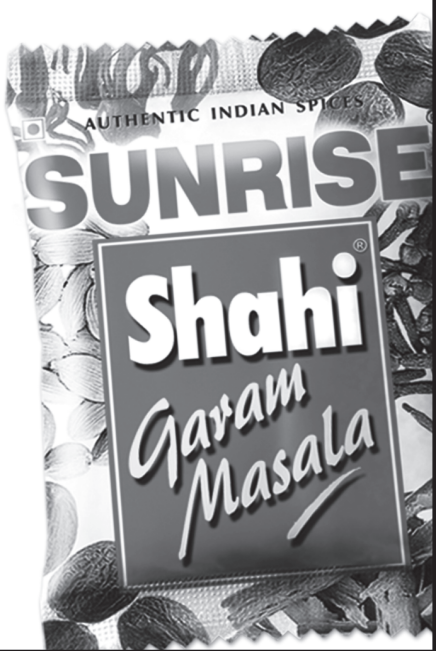

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

সম্পাদকীয়

কৃষিঋণ মকুব এক সস্তা পথ

যেসব রাজ্য কৃষিঋণ মকুব করিবে তাহার দায় কেন্দ্র সরকার গ্রহণ করিবে না। সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে নিজেদের কোষাগার হইতে তাহা মিটাইতে হইবে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি এই কথাটি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়ায় ভালোই হইয়াছে। বিশেষত সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে বিষয়টি স্পষ্ট করিয়া বলিবার আবশ্যকতা রহিয়াছে। কেননা সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি কৃষিঋণ মকুব লইয়া কেন্দ্র সরকারের সাহায্য চাহিতেছে। সম্প্রতি মহারাষ্ট্র সরকার কৃষিঋণ মকুবের কথা ঘোষণা করিয়াছে। অন্যদিকে মধ্যপ্রদেশেও কৃষিঋণ মকুব লইয়া কৃষক সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনার আশ্বাস দিয়াছেন ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। কৃষকদের ঋণ মকুবের প্রতিশ্রুতি দিয়া ক্ষমতায় আসিয়াছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি ইতিমধ্যে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষাও করিতে সচেষ্ট। রাজ্য সরকারগুলির এই সংক্রান্ত দাবিগুলি কেন্দ্রের পক্ষে স্বীকার করা যেমন সম্ভব নয়, তেমন উচিতও নয়। যদি কেন্দ্র কোনো রাজ্যের এই দাবি একবার স্বীকার করে, তবে অন্য রাজ্যগুলি এই দাবি আদায়ে সোচ্চার হইবে। তখন কেন্দ্রের পক্ষে তাহা অস্বীকার করা কঠিন হইবে। এই কথা ঠিক যে আমাদের দেশের কৃষকদের আর্থিক অবস্থা ভালো নহে, তাই তাহাদের আয় বৃদ্ধির জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে এইজন্য কৃষিঋণ মকুব করিতে হইবে। যদিও কৃষিঋণ মকুব বাবদ উত্তরপ্রদেশ সরকার ৩৬ হাজার কোটি টাকা এবং মহারাষ্ট্র সরকার ৩০ হাজার কোটি টাকা ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু দুই রাজ্যের পক্ষেই নিজেদের এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করা যে কঠিন তাহা তথ্যই বলিতেছে। ক্ষমতায় আসিবার পর দুই মাস অতিক্রান্ত হইয়া যাইলেও উত্তরপ্রদেশ সরকার এখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই যে কীভাবে এই ঋণ মকুব করা সম্ভব হইবে। বিড়ম্বনার বিষয় হইল, এই বিষয়ে কেন্দ্র সরকার বারবার স্পষ্টীকরণ এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বারবার সতর্ক করিলেও রাজ্যগুলি কৃষিঋণ মকুবের পথেই হাঁটিতেছে। যেসব রাজ্য কৃষিঋণ মকুবের পথটি সঠিক বলিয়া ভাবিতেছে না, তাহাদের উপর উত্তরপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের পথ অনুসরণ করিবার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হইতেছে। এই সমস্যা হইতে রক্ষা পাইবার একটি মাত্র উপায় হইল কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং সেইসূত্রে তাহাদের উৎপাদিত শস্যের ন্যায্য দাম তাহারা যাহাতে পায় তাহা নিশ্চিত করা।

আজ সকলেরই জানা যে একবার কৃষিঋণ মকুব হওয়ার পর তাহারা অন্য আর এক ঋণের ফাঁদে পড়িয়া যায়। আর এই চক্রের জালে জড়াইয়া পড়িবার কারণে কৃষকরা কখনও আত্মনির্ভর হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। ইহার আরও একটি কারণ যদি হয় কৃষকরা তাহার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পাইতেছে না, অন্যদিকে দ্বিতীয় কারণটি হইল প্রাপ্ত কৃষিঋণের টাকা কৃষির পরিবর্তে অন্য প্রয়োজনে তাহারা ব্যয় করিতেছে। কৃষকদের একটি বড় অংশ কিষাণ ক্রেডিট কার্ড-কে এটিএম কার্ডের মতো ব্যবহার করিতেছে। রাজনৈতিক কারণে কৃষিঋণ মকুবের সম্ভাবনা রহিয়াছে—এই আশাতেও কৃষকরা কৃষিঋণ শোধ করিতে আগ্রহ দেখায় না। তাই রাজ্যগুলিকে কৃষিঋণের দায় নিজেদেরই মিটাইতে হইবে—এই কথা বলিয়া কেন্দ্রের দায়িত্ব শেষ হইবে না, ইহা যে একটি খারাপ দৃষ্টান্ত রাজ্যগুলিকে তাহাও বুঝাইতে হইবে। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিতে হইবে কৃষিকাজের সঙ্গে সঙ্গে পশু পালনাদির মতো আর কী কী কাজের মাধ্যমে কৃষকেরা স্বাবলম্বী হইতে পারে এবং প্রাপ্ত কৃষিঋণ ব্যাঙ্কে শোধ করিতে পারে।

সুভাষিতম্

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।
প্রিয়ং চ নানৃতং ব্রূয়াৎ এষ ধর্মঃ সনাতনঃ।।
সত্য বলবে, প্রিয় বলবে কিন্তু অপ্রিয় সত্য এবং প্রিয় অসত্য বলবে না—এটিই সনাতন রীতি।

ভারতের প্রতিরক্ষা দপ্তর লক্ষ্য স্থির করতে ভুল করেনি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কথায় আছে শুভ সূচনা যদি হয় তাহলে নাকি আরব্ধ কাজের অর্ধেকটাই হয়ে গেল বলে ধরা যায়। দেশের অতিকায় প্রতিরক্ষা দপ্তরে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর একাধিক সাড়া জাগানো নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এগুলির প্রত্যেকটির লক্ষ্যই হচ্ছে জাতীয় সুরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা। কিন্তু এই লক্ষ্য সাধনের জটিলতাগুলিও ক্রমশ সামনে আসছে। মানতেই হবে, বিগত দুটি ইউপিএ জমানায় আট আটটি বছর ধরে পদ আঁকড়ে বসে থাকা ঝুঁকি নিতে অক্ষম বা দেশের প্রয়োজনে কাজ করতে উদ্যোগহীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ কে অ্যান্টনি জমানার সঙ্গে এই জমানার কোনো তুলনা হয় না। প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তের বাস্তব সুফল

অবশ্যই এখনও পরিলক্ষিত হয়নি। প্রথমেই বলতে হয় সেনাবাহিনীতে সরকার একই রকম পদের জন্য একই রকম পেনশন দেওয়ার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। যদিও ২১ লক্ষ লোকের জীবিকা সংক্রান্ত একটা বিশাল বিষয়ে কিছু সংখ্যক লোকের অসন্তুষ্টি ও বিক্ষোভ জন্ম নিতেই পারে। পাকিস্তানের জমিতে ঢুকে জঙ্গি ঘাঁটিগুলিতে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে সেগুলিকে ধ্বংস করে ফিরে আসার সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এই সরকারের সাফল্যের টুপিতে আর একটি পালক যা আগের সরকারের সময় অচিন্ত্যনীয় ছিল।

প্রতিরক্ষা দপ্তরের এ পর্যন্ত কাজকর্ম যে অর্থনৈতিক দুর্নীতির ছোঁয়াচমুক্ত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। চিরাচরিত ক্লেদাক্ত এই দপ্তরের পক্ষে যা অভাবনীয়। এখনও পর্যন্ত জারি থাকা চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ-এর পদাধিকারী এবং বায়ু, জল, স্থলসেনা অধ্যক্ষদের মধ্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির স্পেস, সাইবার স্পেস ও বিশেষ অভিযান চালানোর বিশেষজ্ঞ নির্বাচনের মতো মৌলিক পদ্ধতিগত পরিবর্তন যা ভারতীয় সেনা বাহিনীর প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিকে যুগান্তকারী মাত্রা দিতে পারে— নির্বাচনী ইস্তাহারে সেই ঘোষিত কাজটিতে কিন্তু বিশেষ অগ্রগতি হয়নি।

স্বীকার করতেই হবে এই সরকার জং ধরে যাওয়া স্তূপীকৃত লালফিতের ফাঁস কেটে ফেলেছে। দীর্ঘসূত্রিতায় আবদ্ধ প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয়ের জটিল আবর্তটিকে সরলীকৃত করেছে। এর প্রমাণ রয়েছে ইতিমধ্যে ৩৬টি রাফেল ফাইটার্স, ১৪৫টি M-777 আল্ট্রা লাইট হাউইৎজার কামান, ২২টি Apache attack ও ১৫টি 'চিনুক হেভি লিফট হেলিকপ্টার' কেনার চুক্তি সম্পাদিত হয়ে যাওয়ার মধ্যে। দুরদৃষ্টিসম্পন্ন কাজের মধ্যে সেনাবাহিনীর নির্দিষ্ট পদাধিকারীর হাতে প্রতিবেশী দেশের হিংস্র শত্রুর মোকাবিলায় প্রয়োজন বুঝলেই অন্তত ১০ দিনের গোলাবারুদের রসদ যাতে মজুত রাখা যায় তার সম্পূর্ণ সরাসরি চাওয়ার ও জরুরি ভিত্তিতে পাওয়ার ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে সরকার। কিন্তু সশস্ত্র বাহিনীর হাতে প্রয়োজনের তুলনায় যুদ্ধসামগ্রী মোটেই পর্যাপ্ত নয়। সাবমেরিন থেকে শুরু করে ফাইটার বিমান, মাল্টি রোল হেলিকপ্টার থেকে রাতে দীর্ঘসময় যুদ্ধ চালানোর উপযুক্ত সমরোপকরণ এখনও বাহিনীর হাতে নেই। এই সূত্রে, দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা ১২৬টি Medium Multi-Role Combat aircraft-এর চুক্তি বাতিল করে ফ্রান্স থেকে ৫৯ হাজার কোটি টাকা দিয়ে ৩৬টি রাফেল বিমান ক্রয় করলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

ভারতের বায়ুসেনাকে এখন ৩৩টি লড়াকু ফাইটার স্কোয়াড্রন (এক স্কোয়াড্রনে ১৮টি জেট বিমান থাকে) নিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছে, যেখানে চীন ও পাকিস্তানের যৌথ পাল্লা নিতে গেলে অন্তত ৪৪টি স্কোয়াড্রন মজুত রাখা দরকার।

পুরোসময়ের প্রতিরক্ষামন্ত্রী থাকার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা এক্ষেত্রে না থাকায় সমস্যা হচ্ছে। এখন জেটলি একবার এ-ঘর, একবার ও-ঘর করছেন।

এতদ্‌সত্ত্বেও বলা যায় যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় দ্রুততর হয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত ১৪০টি মূলধন সংগ্রহের প্রকল্প (capital processing project)-কে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মূল্য ৪ লক্ষ কোটি টাকা। ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা প্রকল্প মূল্যের ৯৬টি ক্ষেত্রে উৎপাদন ভারতের মধ্যেই হবে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় দেশের বার্ষিক বাজেটে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে কোনো খরচ বৃদ্ধির প্রস্তাব নেই। ২০১৭-১৮ প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ২.৭৪ লক্ষ কোটি টাকা যা অভীষ্ট জিডিপি-র মাত্র ১.৬৩ শতাংশ। উল্লেখ্য, ১৯৬২ সালে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পর এইটিই সবচেয়ে কম জিডিপি-বাজেট খরচ অনুপাত; পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে লক্ষ্য স্থির আছে কিন্তু পথ এখনও অনেক বাকি যার আশপাশগুলিতে অবশ্যই সাফল্যের ঝলকানি নজরে পড়ছে।

মহেঞ্জোদারো সভ্যতা আবিষ্কারের গৌরব রাখালদাসকে দেয়নি ইংরেজ শাসকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ঐতিহাসিক ফণীকান্ত মিশ্র তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থে 'Rakhaldas Banerji' The forgotten Archeologist' সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কারক হিসেবে প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস ব্যানার্জীর প্রাপ্য গৌরব নিছক চৌর্যবৃত্তির মাধ্যমে ইংরেজরা নিজেদের নামে প্রচার করেছিল বলে সরাসরি দাবি করেছেন। এই মর্মে তিনি ভারতীয় জাদুঘরে তথ্য প্রমাণ সহ এক দীর্ঘ বক্তৃতায় রাখালদাসের বঞ্চনার কথা তুলে ধরেন।

ইংরেজ আমলে ভারতীয় জাদুঘরের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘসময়ের (১৯০২-২৮) নির্দেশক জন মার্শাল ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিলেও রাখালদাসের ক্ষেত্রে তিনি অভিযোগের উর্ধ্বে নন।

শ্রী মিশ্রের তথ্য অনুযায়ী মহেঞ্জোদারো খনন কার্য সংক্রান্ত প্রথম রিপোর্টটি রাখালদাস ১৯২০ সালেই কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেন। নির্দেশক মার্শাল পরবর্তীকালে তা সম্পূর্ণ চেপে যান। রাখালদাসের দাখিল করা অন্তবর্তী সরেজমিন প্রতিবেদনগুলিও মার্শাল নিজের মতো করে সম্পাদনা করেন ও তাঁর নিজ লিখিত গ্রন্থে 'Mohenjo-Daro & the Indus civilisation– a monumental volume' অবলীলায় অন্তর্ভুক্ত করে নন। মিশ্র তাঁর ভাষণে বলেন, 'it was a bhatant theft of intellectual property right'। মার্শালের এই কাজ যে একজন তরুণ প্রত্নতাত্ত্বিকের (রাখালদাসের বয়স তখন মাত্র কুড়ি) অর্জিত সম্মান অপহরণ করার শামিল সে কথা জানাতে দ্বিধা করেননি।

তৎকালীন সংরক্ষিত তথ্য অনুযায়ী রাখালদাস ১৯১৮-২২ পর পর পাঁচটি ঋতুতে মহেঞ্জোদারোর ওপর নিয়মমাফিক গবেষণালব্ধ প্রতিবেদনও জমা দিয়েছিলেন। মার্শাল ১৯২৪ সাল অবধি মহেঞ্জোদারোর নামও শোনেননি। তিনি ১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রথম সেখানে যান। অথচ আজ সারা পৃথিবীর মানুষ জানে মার্শালই মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। কেবলমাত্র একটি নগন্য টীকায় রাখালদাসের নাম পাওয়া যায়। বিদ্যালয়েও তাই পড়ানো হয়। প্রসঙ্গত ১৯২৫ সালে সুযোগ বুঝে মার্শাল খননকাজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেন ততদিনে কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস সব কিছুই করে ফেলেছিলেন। মিশ্রের তথ্য অনুযায়ী এই সময় অত্যন্ত হতাশ রাখালদাস তৎকালীন বাংলার অন্যতম সেরা পণ্ডিত পরবর্তীকালে আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে জানান যে, "ইংরেজরা তাঁকে মহেঞ্জোদারো সম্পর্কে কিছুই প্রকাশ করতে দেবে না। আপনি দয়া করে আমার সংগৃহীত কাগজপত্র দেখে কিছু লিখুন। যাবতীয় ছবি ও নিদর্শন যতটুকু রাখতে পেরেছি তাও আপনাকে দিলাম। পরবর্তী প্রজন্মের সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য জানার জন্য এগুলি প্রকাশ করা নিতান্তই জরুরি— তা তো আপনি জানেনই।"

এর পরই হতভাগ্য রাখালদাসকে ভারতীয় জাদুঘরের অধিকর্তা হিসেবে বদলি করা হয়। মহেঞ্জোদারো আবিষ্কারের যাবতীয় গৌরব ও সাফল্য অপহৃত করে নেন জন মার্শাল। ভারত ইতিহাসের এমন এক অজানা কাহিনির উদ্ঘাটন করে শ্রী মিশ্র গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন।

সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে গর্বিত কাশ্মীরি যুবকেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। জেনারেল উমর ফৈয়জ বেঁচে থাকলে তাঁর ভালো লাগত। তাঁর প্রিয় জম্মু ও কাশ্মীর থেকে এগারো জন যুবক দেরাদুনের ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি থেকে পাশ করে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। শুধু যোগ দিয়েছেন বললে কম বলা হয়, সেনাবাহিনীর উর্দি তাদের বুকের মাপ এক লহমায় কয়েক ইঞ্চি বাড়িয়ে দিয়েছে। উমর ফৈয়জকে তারা সকলেই চিনতেন। বস্তুত উমর ফৈয়জের মৃত্যু কাশ্মীরি যুবকদের একটা বড়ো অংশকে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ প্রসঙ্গে সদ্য কাজে যোগ দেওয়া সেনা- আধিকারিক মহম্মদ সলমন বলেন, 'ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি-তে উনি আমার থেকে দু'বছরের সিনিয়র ছিলেন। ওর কথা কখনও ভুলব না।' উল্লেখ্য, উমর ফৈয়জ মে মাসে দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়নে জঙ্গিদের গুলিতে নিহত হন। ২৩ বছরের উমর ফৈয়জ তখন ছুটিতে ছিলেন। তাঁর কাছে না ছিল বন্দুক, না সামান্য প্রস্তুতি। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড কাশ্মীরি যুবমানসে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। তাদের একটা বড়ো অংশ ভারতকে আর শত্রুদেশ বলে মনে করছে না। বরং সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইছে।

কংগ্রেসের জন্যই অগ্নিগর্ভ মধ্যপ্রদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কংগ্রেসের যাবতীয় চক্রান্ত ব্যর্থ করে অবশেষে শান্তি ফিরল মধ্যপ্রদেশে। কংগ্রেসের জন্য সে রাজ্যে পরিস্থিতির এতটাই অবনমন হয়েছিল যে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহানকে অনশনে বসতে হয়। যাঁদের মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা করেছিল কংগ্রেস, তাদের পরিবারের অনুরোধেই শিবরাজ তাঁর অনশন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন বলে একটি

কৃষকদের গুণ্ডারা অশান্তি পাকাতে রাস্তায় নেমেছে।

সূত্রের খবর। ইতিপূর্বে সোশ্যাল মিডিয়ায় দু'টি ফেসবুক পোস্ট ভাইরাল হয়েছে। এর মধ্যে একটিতে দেখা যাচ্ছে করৈনার কংগ্রেসি মহিলা বিধায়ক শকুন্তলা খাটিক উস্কানি দিচ্ছেন থানা ভাঙচুর করতে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতে, অন্য একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে রাউয়ের কংগ্রেসি বিধায়ক জিতু পাটওয়ারি প্রশাসনের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে কীভাবে ইন্দোরের কেরাম মাণ্ডিতে অশান্তি সৃষ্টি করছেন। সব মিলিয়ে মধ্যপ্রদেশের ঘটনার পেছনে কংগ্রেসের ইন্ধনের বিষয়টি ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছে। পর্দা ফাঁস হতেই কংগ্রেস একটি জাল ভিডিও হাজির করে প্রমাণের চেষ্টা করে ঘটনায় নাকি বিজেপির এক নেতার ইন্ধন রয়েছে। কিন্তু একটি দলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি কেন তার সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানি দেবে তার সদুত্তর মেলেনি।

অন্যদিকে প্রশাসনের একটি সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে এই হিংসাপ্রবণ আন্দোলনের পেছনে 'গভীর চক্রান্ত' রয়েছে। প্রশাসনের বক্তব্য এই ব্যাপক হিংসার পেছনে প্রকৃত চক্রীদের খুঁজে বের করাই এখন তাদের মুখ্য চ্যালেঞ্জ। প্রকৃত কৃষকেরা কোনোদিন এমন হিংসাত্মক আন্দোলনে যেতে পারেন না, আর গ্রামের পর গ্রাম উজিয়ে এভাবে একে সঙ্ঘবদ্ধ রূপ দেওয়াও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রশাসনের এও বক্তব্য যারা আন্দোলনে এসেছিল তাদের অনেকেরই মুখ ঢাকা ছিল। যে কারণে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করাও এখন কঠিন হয়ে পড়ছে। সবচেয়ে বড় কথা, এই মুখগুলির ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন এখনও বেশ অন্ধকারে। তাই সন্দেহ দৃঢ় হচ্ছে যে এরা প্রত্যেকেই বহিরাগত এবং গোলমাল পাকাতেই এদের আনা হয়েছিল।

অথচ কৃষকদের আন্দোলন গত ১ জুন বেশ শান্তিপূর্ণ ভাবেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু ৬ জুন থেকে তা হঠাৎই হিংস্র আকার ধারণ করে। পরিস্থিতি এতই জটিল হয় যে মন্দসোরের জেলা শাসক এস কে সিংহের ওপর হামলা হয় এবং পুলিশকে গুলি চালাতে বাধ্য করা হয়। পরে এস কে সিংহকে সরিয়েও দেওয়া হয়। গোটা ঘটনার মধ্যে পাকামাথার খেলা দেখতে পাচ্ছেন গোয়েন্দারা। যে মাথাগুলি জে এন ইউতে আফজল গুরুর জন্মদিন পালন করে কিংবা গোরক্ষকদের জুজু দেখিয়ে বা পাকিস্তান-চীনের পক্ষে মতপ্রকাশের মধ্যে দিয়ে বিগত দিনগুলিতে ভারতবর্ষে অশান্তির চেষ্টা করেছিল, তারাই এরকম তথাকথিত 'কৃষক অসন্তোষ'-এর জন্য দায়ী কিনা তাও তদন্তের আওতায় আসা উচিত বলে বিশেষজ্ঞদের মত। তবে ঠাণ্ডা মাথায় পুরো বিষয়টি যেভাবে সামাল দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান তাতে রাজনৈতিক মহলের প্রশংসা তিনি লাভ করেছেন।

কংগ্রেস নেতা সন্দীপ দীক্ষিত ভারতীয় সেনাধ্যক্ষকে 'রাস্তার গুণ্ডা' বললেন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সাংসদ সন্দীপ দীক্ষিত (দিল্লির পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিত-পুত্র) ভারতীয় সেনাধ্যক্ষ জেনারেল বিপিন রাওয়াতকে একজন 'রাস্তার গুণ্ডা'র সঙ্গে তুলনা করলেন। এই কুশ্রী খবর চাউর হবার পরই টিটি পড়ে যায়। বিজেপির পক্ষ থেকে কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধীর তরফে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানানো হয়।

সন্দীপ দীক্ষিত বলেন, 'পাকিস্তানের সেনাবাহিনী যারা রাস্তার গুণ্ডার মতো কথাবার্তা বলে থাকে ভারতের সেনাবাহিনী তাদের মতো মাফিয়া বাহিনী নয়। তাই এটা দেখলে খুব খারাপ লাগে যখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান রাস্তার গুণ্ডার মতো ('সড়ক কা গুণ্ডা') আচরণ করেন।' তিনি আরও বলেন, 'ভারতীয় সেনাবাহিনী একটি প্রতিষ্ঠানের মতো, যার নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। আমার মনে হয় না আমাদের সেনাপ্রধান তাঁর মর্যাদা রাখতে পারছেন। আমার মনে সেনাপ্রধানের যে ভাবমূর্তি রয়েছে তার সঙ্গে মি. রাওয়াত খাপ খাচ্ছেন না। আমার মনে হয় তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্য রাখা উচিত নয়।'

পরিস্থিতি যে গোলমেলে হয়ে উঠছে টের পেয়ে তড়ি ঘড়ি তিনি টুইট করে জানান, 'সেনাবাহিনীর প্রধানের বক্তব্যের ওপর তাঁর কিছু বলার থাকলেও এ বিষয়ে তাঁর (নিজের) শব্দচয়ন ভুল হয়েছে।' তিনি তাঁর বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেছেন, 'আজ কংগ্রেসের কতটা অধোগতি হয়েছে। কোন সাহসে তারা দেশের সেনাধ্যক্ষ সম্পর্কে এমন নিম্নরুচির কথাবার্তা বলছে?'

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তানের হার

ফেসবুকে দেশবিরোধী মন্তব্য, পুরুলিয়ায় মুসলমানদের তাণ্ডব

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে ক্রিকেট ম্যাচ হলে ভারতের মুসলমানদের একটা বড়ো অংশ পাকিস্তানকে সমর্থন করেন। হেরে গেলে আইনও নিজেদের হাতে তুলে নেন। সম্প্রতি এর প্রমাণ পাওয়া গেল পুরুলিয়ায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ৪ জুন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তান ভারতের কাছে হেরে যাওয়ার পর রানিবাঁধ এলাকার ৯নং ওয়ার্ডের নিশান আলি ফেসবুকে বেশ কিছু ভারত বিরোধী মন্তব্য করে। অভিযোগ, পোস্টটিতে ভারতের নামে মুর্দাবাদ ধ্বনি দেওয়া হয়। জানাজানি হবার পর স্থানীয় মানুষ নিশান আলিকে দেশবিরোধী কার্যকলাপের জন্য পুলিশের হাতে তুলে দেন। এরপরেই শুরু হয় গণ্ডগোল। কসাইমহল্লার প্রায় পাঁচ-ছ'শো মুসলমান দুষ্কৃতী, নিশান আলিকে কেন গ্রেপ্তার করা হলো? অবিলম্বে তাকে ছেড়ে দিতে হবে— এই দাবিতে হিন্দুদের বাড়িতে চড়াও হয়। পুরুলিয়া বাজারে হিন্দুদের দোকানপাটে অবাধ ভাঙচুর চালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ, এই ঘটনার পিছনে রয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের উস্কানি। বস্তুত শাসকদলের দু'ই নেতার প্রশ্রয়েই মুসলমান দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব দিন-দিন বাড়ছে বলে এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন হিন্দু।

উবাচ

"সেনাপ্রধান সম্বন্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করা ওর উচিত হয়নি। ক্ষমা চেয়ে উনি ঠিকই করেছেন। সেনা আমাদের রক্ষা করে। সেনাপ্রধানকে নিয়ে খারাপ মন্তব্য করা কারোরই উচিত নয়।"

রাহুল গান্ধী
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক

সেনাপ্রধানকে নিয়ে কংগ্রেস নেতা সন্দীপ দীক্ষিতের মন্তব্য প্রসঙ্গে।

"সংখ্যালঘুর সংজ্ঞা যদি পুনর্বিবেচনা করা হয়, তাহলে কাশ্মীরি পণ্ডিতদেরই সেই মর্যাদা প্রথমে প্রাপ্য।"

গাইরু হাসান রিজভি
চেয়ারম্যান, ন্যাশনাল কমিশন অব মাইনোরিটিস

ইংরাজি দৈনিককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে।

"গত তিন বছরে সব রকমের অসুবিধা ও বাধা-বিপত্তির মধ্যেও আমরা প্রমাণ করেছি যে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও এক মহান জাতি গঠন সম্ভব।"

অমিত শাহ
বিজেপি সভাপতি

সেবাগিরি নামে এক পত্রিকা উন্মোচনের অনুষ্ঠানে।

"যতদিন পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়া বন্ধ না করবে, ততদিন পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো ক্রিকেট সিরিজ খেলবে না ভারত।"

বিজয় গোয়েল
কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী

পাকিস্তানের সঙ্গে টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ প্রসঙ্গে।

"আমি কৃষকদের সবসময়ে পাশে আছি, সংকটেও তাদের সাহায্য করেছি। ন্যায়ের দরজা তাঁদের জন্য সবসময় খোলা।"

শিবরাজ সিংহ চৌহান
মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী

মধ্যপ্রদেশে কৃষিঋণ মকুব নিয়ে কৃষকদের অসন্তোষ প্রসঙ্গে।

মমতার অপরিণামদর্শিতাই পাহাড়ে আগুন জ্বালিয়েছে

যাঁরা ভাবছেন মমতার দাবড়ানিতে পাহাড় এবার শান্ত হয়ে যাবে, তাঁরা মস্ত ভুল করছেন। বরং মমতা যা করছেন তাতে পাহাড়ে অশান্তির আগুন দ্রুত ছড়াবে। তৃণমূল নেত্রী চাইছেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা বিমল গুরুং সহ মোর্চার ৩০-৩৫ জন প্রথম সারির নেতাকে জেলে পুরতে। অর্থাৎ মোর্চার নেতাদের জেলবন্দি করলে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জি টি এ) নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীরাই একতরফাভাবে জিতবে। এইভাবেই তৃণমূলপন্থীরা সাম্প্রতিককালে অধিকাংশ জেলাতে নির্বাচনে জিতেছে। পাহাড়ের নির্বাচনেও সেভাবে জিততে চাইছে। মিরিকে পুরসভার জয়ের পর দার্জিলিং, কার্সিয়াং জয়ের স্বপ্ন দেখছেন তিনি। জিটিএ গঠিত হয়েছিল ২০১১ সালের ১৮ই জুলাই। মমতা তখন প্রথমবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। অশান্ত পাহাড়ের মানুষের মন জয়ের জন্য তিনি বিমল গুরুংয়ের নেতৃত্বে জিটিএ গঠনের সম্মতি দিয়েছিলেন। বিধানসভায় বিশেষ বিল পাশ করিয়ে দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং, মিরিক-সহ ডুয়ার্সের একটা বড় এলাকাকে জিটিএ-র প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারে আনেন। এই বিলে স্পষ্ট বলা হয় যে পাহাড়ে রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতা জিটিএ-র হাতে সমর্পণ করা হবে।

এই পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল। মমতা তখন প্রায়ই বলতেন, 'পাহাড় হাসছে'। সমস্যাটা শুরু হলো ৪৫ সদস্যের জিটিএ পর্ষদের নির্বাচনে। ২০১২ সালের এই নির্বাচনে তৃণমূলের একজন প্রার্থীও জিততে পারেননি। জিটিএ-র ৪৫টি আসনেই মোর্চার প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জেতেন। এতেই দিদির গোঁসা হয়। তিনি এর শোধ তুলতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করেন। দার্জিলিং পাহাড় এলাকার উন্নয়নের জন্য গুচ্ছ গুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করতে থাকেন। সংখ্যালঘু লেপচা সম্প্রদায়কে গোর্খা সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন করতে ক্রমাগত মদত দিতে শুরু করেন। লেপচারা কালিম্পং মহকুমায় বাস করেন। মমতা কালিম্পংকে আলাদা মর্যাদা দেন যাতে দার্জিলিংয়ের গোর্খা নেতারা সেখানে লাঠি ঘোরাতে না পারেন। অথচ জিটিএ গড়তে যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয় তাতে স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে যে এই স্বশাসিত প্রশাসনিক সংস্থাই তার অধিকারে থাকা এলাকার ব্যাপারে সব ধরনের সিদ্ধান্ত নেবে। রাজ্য সরকার নয়। একমাত্র আইন প্রণয়নের অধিকার রাজ্য সরকারের হাতে থাকবে। কিন্তু এই চুক্তি রাজ্য সরকার মানেনি। জেলাশাসক

গূঢ় পুরুষের কলম

এবং পুলিশ সুপার নবান্নের প্রতিনিধি হয়ে প্রশাসন চালাচ্ছেন। 'Power of the State Government to be transferred to the G.T.A.' চুক্তির এই শর্তটি উপেক্ষা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা থেকেই পাহাড়ের প্রসাশন অতীতে যেমন চলতো তেমনই চলতে থাকলো। তবে এত ঘটা করে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নামের স্বশাসিত সংস্থা গড়ার প্রয়োজনটা কী ছিল। পাহাড়ের মানুষের কী ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প দরকার তার রূপরেখা জিটিএ-র করার কথা। মমতার নয়। যেহেতু প্রকল্প রূপায়ণে রাজ্য সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন তাই জিটিএ-র চেয়ারম্যান বিমল গুরুং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবেন। এটাই প্রচলিত নিয়ম। প্রতি মাসে মুখ্যমন্ত্রী একবার করে দার্জিলিং সফরে আসেন। ভাল কথা। অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু দার্জিলিং সফরে এসে তিনি জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের সঙ্গে যতবার বৈঠক করেছেন তার এক শতাংশও তিনি জিটিএ-র সদস্যদের সঙ্গে করেননি। বিমল গুরুংদের পাত্তা না দেওয়া থেকে বুঝতে অসুবিধা নেই যে তাঁর মূল লক্ষ্য রাজনীতি করা। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা দলটি কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন এনডিএ-র শরিক। দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিজেপির। তাই মোর্চা পরিচালিত জিটিএ-কে পঙ্গু করে রাখতে হবে। বিমল গুরুংরা নন, জেলাশাসকই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো পাহাড়ের প্রশাসন চালাবেন। এটা ঠিক নয়। জেলাশাসক প্রশাসন পরিচালনা করবেন জিটিএ-র পরামর্শমতো। নবান্নের নির্দেশে নয়। নেহরুর অপরিণামদর্শিতার জন্য গত সত্তর বছর ধরে কাশ্মীরে অশান্তির আগুন জ্বলছে। ক্ষমতার দর্পে দর্পিত বাংলার প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ের মানুষের স্বশাসনের অধিকার দেওয়ার প্রতিশ্রুতিকে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে অশান্তির আগুন জ্বালাতে চাইছেন। পাহাড়ের মানুষের সঙ্গে সমতলের মানুষের বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছেন। অথচ আন্দোলনের প্রথমদিনেই তিনি সপার্ষদ বিমল গুরুংকে ডেকে জানতে চাইতে পারতেন বিক্ষোভ কেন? বাংলা ভাষাকে পাহাড়ে আবশ্যিক করা হয়নি, এই সহজ সরল কথাটি বিমল গুরুংকে দিয়ে ঘোষণা করাতে তাঁর অসুবিধা হলো কেন? সবকিছু স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীকেই চোঙা ফুঁকে বলতে হবে কেন?

মমতা জানিয়ে দিয়েছেন যে বিমল গুরুং-সহ জিটিএ-র অধিকাংশ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হবে। ইতিমধ্যেই চুনোপুটি মোর্চা নেতাদের ধরপাকড় শুরু হয়েছে। এটা ভুল নীতি। অতীতে জ্যোতিবাবুরা এই নীতি অনুসরণ করে বাংলাকে ডুবিয়েছেন। মমতা সিপিএমের পথেই হাঁটতে চাইছেন। এর ফল ভাল হবে না। লাঠি-গুলি চালিয়ে যদি সব সমস্যার সমাধান সহজে হয়ে যায় তবে অর্ধ শতাব্দী আগেই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু তা হয়নি। পাহাড়ের সমস্যার সমাধান সুসম্পর্ক ও আলোচনার মাধ্যমেই করতে হবে। পুলিশের লাঠি দিয়ে নয়। ক্ষমতার দর্প মমতাকে ভুল পথে পরিচালিত করছে। অথচ বিজেপি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবি মানা হবে না। তারপরেও মমতা বলছেন, বিজেপি পাহাড়ে অশান্তির প্ররোচনা দিচ্ছে। এটা অন্যায়। মানুষকে ভুল বোঝানো হচ্ছে। এটা রাজনীতি নয়। নিছক নোংরামি। ■

কেন দিদি কাঁদালে এমন ?

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী
নবান্ন, হাওড়া,

আপনিই তো বলেছিলেন পাহাড় হাসছে। বাম আমলে কাঁদা পাহাড়কে আপনি হাসিয়েছেন। সত্যি মিথ্যে জানি না, আপনি বলেছেন পাহাড় হাসছে। অতএব হাসছে। এই বিশ্বাসে আমি এবং আমার মতো অনেক পাহাড় প্রেমী আপনাকে সমর্থন করেছে।

আম বাঙালির পর্যটন মানে 'দীপুদা'— দীঘা, পুরী, দার্জিলিং। তার একটা কমে গেলে বাঙালির কষ্ট হয়। গ্রীষ্ম কাতর রাজ্যবাসী তাই পাহাড়ের হাসি দেখে আপনাকে আশীর্বাদ করেছে। এবার কান্নার দায় তো আপনাকে নিতেই হবে। আপনার বিরোধীরা কী বলছেন তাকে আমি পাত্তা দিই না। কিন্তু এই দাবি মমতা-প্রেমী আমরাও। কাঁদানোর দায় আপনার।

রাজনীতির আগুনে পাহাড় জ্বলছে। আপনার উপস্থিতিতে বিক্ষোভের চেহারাই বলে দিচ্ছে সহজে নেভার নয় এই আগুন। পুলিশ ও সেনা নিয়ন্ত্রণে পরিস্থিতি আনতে পারলেও রাজনৈতিক উত্তাপ থেকে সহজে রক্ষা পাবে না বাঙালির প্রিয় পর্যটন শহর দার্জিলিং। কারণ, পাহাড় নিয়ে রাজনীতি নতুন নয়। আর সেই রাজনীতিতে এখন লেগেছে নতুন রং।

বাম আমল থেকেই পাহাড় বারবার রাজ্য প্রশাসনের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক সময়ে সুবাস ঘিসিংয়ের গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (জি এন এল এফ)-কে নিয়ে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে জ্যোতি বসু কিংবা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সরকারকে। পাহাড়ে ঘিসিংয়ের দাপট কমতেই নতুন করে শক্তি নিয়ে পাহাড়ে আগুনে রাজনীতি শুরু করে বিমল গুরুংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। এর পরে জিটিএ গঠন করে কিছুদিনের জন্য পাহাড়কে শান্ত রাখতে পারলেও তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক বেশিদিন টেকেনি।

২০০৯ সালে জিজেএম বুঝতে পারে তৃণমূল কংগ্রেস ভাল বন্ধু নয়। আসলে বন্ধু বেশে ক্ষমতা দখল করতে এসেছে। বিজেপিকে নির্ভরযোগ্য বন্ধু মনে করেন বিমলরা। মোর্চার সমর্থনে পাহাড় থেকে দিল্লি যান বিজেপি সাংসদ এসএস আলুওয়ালিয়া। মাঝে কিছুদিন পাহাড় তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে থাকলেও ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে পুরনো পথেই হাঁটে মোর্চা। বিজেপির আলুওয়ালিয়াকেই জেতায় বিমল গুরুংদের সমর্থন।

এখন যে তৃণমূল বিরোধী মনোভাব নিয়েছেন বিমল গুরুংরা তার পিছনেও রয়েছে রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। একদিকে পাহাড় ঘাসফুলের দাপট প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য। অন্য দিকে, পাহাড় নিজেদের মুঠোয় রাখতে মোর্চার মরণপণ লড়াই। এবার সেই লড়াই সরাসরি প্রশাসনের সঙ্গে আগুনে যুদ্ধের রূপ নিল। একটা কথা তো ঠিক দিদি, পাহাড়ে বিজেপি গিয়ে পাহাড়বাসীকে ভাগ করতে চায়নি। গোর্খাল্যান্ডের দাবিকে সমর্থন না জানালেও বিজেপি পাহাড়কে আরও ভাগ করেনি। আপনি কিন্তু পাহাড়ি মানুষদের নানা ভাগে ভাগ করে দিয়েছেন। যাতে ভবিষ্যতে আরও বেশি বেশি বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিতে পারে।

দিদি অনেক বলেছেন নরেন্দ্র মোদী সরকারকে সব সময়ে যে কোনোও ইস্যুতে অস্বস্তিতে ফেলাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজ। নোট বাতিল থেকে জিএসটি সবেতেই কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করার নীতি নিয়ে চলছে তৃণমূল কংগ্রেস। পাহাড় রাজ্য সরকারকে শিক্ষা দিল। এটাই পাওনা ছিল তৃণমূলনেত্রীরা। তিনি ঠিক যে কাজটা কেন্দ্রের সঙ্গে করেন সেটাই ফিরিয়ে দিচ্ছে পাহাড়। এটা হওয়ারই ছিল। তাঁরা আরও বলছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশে বার বারই হুমকি দিতে শোনা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এবার তাঁর ভাষাতেই যেন তাঁকে হুমকি দিলেন মোর্চা প্রধান বিমল গুরুং।

পাহাড়ে নিজের রাজনৈতিক শক্তি বিস্তার করার স্বপ্নে আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো বেশিই আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়েছিলেন। তার জেরে গোটা মন্ত্রীসভা ও সরকারের শীর্ষ আমলাদের নিয়ে দার্জিলিঙে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেন আপনি।

দিদি, আপনার পাহাড় হাসছে না, কাঁদছেও না। রাগে ফুঁসছে। পাহাড়ে শান্তি ফিরিয়ে আনার কৃতিত্ব যেমন নিয়েছিলেন, অশান্তি সামলানোর দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে।

—সুন্দর মৌলিক

ছাপান্ন ইঞ্চি বনাম কামিয়ে নেওয়াদের জোট

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

কথায় আছে, চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। এই মাসতুতো ভাই-বোনেরা এখন একটি জোট বেঁধেছেন। জোট বেঁধেছেন দুটি উদ্দেশ্যে। (১) নরেন্দ্র মোদীর অগ্রগতির রথটিকে যে কোনো উপায়ে রুখতে হবে; তার জন্য দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি যদি করতে হয়, তাতেও কুছপরোয়া নেই। (২) নিজেদের যাবতীয় দুর্নীতি ঢাকতে তস্করদের ঐক্য সম্মিলনী গড়ে তোলা। সোনিয়া, মমতা, অখিলেশ, মুলায়ম, মায়াবতী, লালুপ্রসাদ, সীতারাম মিলে যে মহাজোট গড়ে তোলার ডাক দিচ্ছেন, সংক্ষেপে এই হচ্ছে সেই মহাজোটের নমুনা। কোনো আদর্শের তাগিদে যে এঁরা মহাজোটের ডাক দিয়েছেন, এমন যদি কেউ ভাবেন— তার সে ভাবনা হবে নিতান্তই ভুল। মহাজোটের এই নেতা-নেত্রীরা তাঁদের রাজনৈতিক অভিধান থেকে অনেক আগেই নীতি-আদর্শ শব্দগুলিকে বিদায় দিয়েছেন। এঁরা জোট করেছেন শুধুমাত্র নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করতে। এক কথায়, এঁদের জোট একটি লোকঠকানো জোট।

কারা এই জোটের প্রবক্তা? কারা নরেন্দ্র মোদীকে পরাজিত করে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে দিল্লির ক্ষমতা দখল করার স্বপ্ন দেখছেন? দেখছেন, লালুপ্রসাদ যাদব। ভারতের রাজনীতিতে সবথেকে দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক চরিত্র হিসেবে যাদের নাম করতে হয়, লালুপ্রসাদ তাদের ভিতর অন্যতম। পশুখাদ্য কেলেঙ্কারীতে জেলখাটা এই রাজনীতিক ইতিমধ্যেই সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে নির্বাচনে লড়ার অধিকার হারিয়েছেন। এই পশুখাদ্য মামলাতেই আবার নতুন করে আদালতের সমন কড়া নাড়ছে তাঁর দরজায়। দিল্লির ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখছেন উত্তরপ্রদেশের বহেনজি মায়াবতী। রাজনৈতিক জীবনে দুর্নীতি করে আখের গোছানোয় তিনিও কিন্তু কম যান না। নানাবিধ দুর্নীতির মামলার সঙ্গে তাঁর নামটিও জড়িত রয়েছে। দলিতদের আবেগ ভাঙিয়ে নিজের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করেছেন এতকাল। কিন্তু দলিতরাও এখন বহেনজির আসল চেহারাটি চিনে নিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে দলিতরা তাই বহেনজির সঙ্গ ত্যাগ করেছে। ক্ষমতা দখলের দৌড়ে নেমেছে উত্তরপ্রদেশের যাদব পরিবারের পিতা-পুত্র মুলায়ম এবং অখিলেশ। এই পরিবারটি যে আদতে একটি রাজনৈতিক মাফিয়া পরিবার— তা বিশ্ব সংসারের সকলেই জানে। কুখ্যাত গুণ্ডা, মস্তান, সমাজবিরোধী, খুনি, ধর্ষকদের সঙ্গে এই পরিবারের ওঠাবসা। মুলায়ম এবং অখিলেশের শাসনকালে সমগ্র উত্তরপ্রদেশ কার্যত জঙ্গলের রাজত্বে পরিণত হয়েছিল। দুর্নীতির পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এই পরিবারটিকে গত বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। নিধিরাম সর্দারের মতো দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালও এই মওকায় মোদী বিরোধিতায় নেমে পড়েছেন। কেজরিওয়ালের ধাপ্পাবাজির রাজনীতিটি অবশ্য ইতিমধ্যেই দিল্লিবাসী এবং দেশবাসীর কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে। সততার বুলি আউড়ে আসা কেজরিওয়াল ক্ষমতায় বসার পর থেকেই একে একে তাঁর মন্ত্রীসভার বেশ কয়েকজন সদস্য দুর্নীতির মামলায় ফেঁসেছেন। সর্বশেষে কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধেও ঘুষ খাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। দিল্লি পুরভোটে এই কেজরিওয়াল এবং তাঁর পার্টিকে দিল্লির মানুষ ঝাঁটা মেরেই বিদায় করেছে। এঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদীর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। সীতারাম সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে গেলে এটুকুই বলতে হয় যে, তিনি হচ্ছেন গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। সীতারামের দল সারা দেশেই এখন অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। দিল্লির রাজনীতিতে কোনো গুরুত্বই এখন সীতারামের দলের নেই। তবু বিরোধী জোট গঠনের নামে লম্ফঝম্পের কোনো বিরাম নেই সীতারামের। সীতারাম এবং তাঁর দলের সমস্যাটি অবশ্য অন্য। এতদিন কংগ্রেসের প্রসাদধন্য হয়ে নানাভাবে করে-কম্মে খেয়েছেন তাঁরা। ভারতের রাজনীতিতে কংগ্রেস ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সীতারামদেরও করে কম্মে খাওয়ার দিন গিয়েছে। তদুপরি, পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটিতে চৌত্রিশ বছর লাগামছাড়া দুর্নীতি এবং অবাধ সন্ত্রাসের রাজত্ব চালানোর পর, সেখানে পার্টির লালবাতি জ্বলেছে। পাশের রাজ্য ত্রিপুরাতেও প্রায় যাই যাই অবস্থা।

এই হাঁসজারু গোছের মহাজোটটির প্রধান প্রবক্তা নেহরু-গান্ধী পরিবারের ইটালিয়ান বধূ সোনিয়া গান্ধী এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোনিয়া গান্ধী এমন এক পরিবারের বধূ, যে পরিবারটি সেই স্বাধীনতার লগ্ন থেকেই ভারতবাসীর সঙ্গে প্রতারণা এবং তঞ্চকতা করে এসেছে। যে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে আজ সমগ্র দেশ উদ্বিগ্ন, সেই কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতের পুতুল করে দিয়ে গিয়েছিলেন এই পরিবারেরই অন্যতম পুরুষ জওহরলাল নেহরু। নেতাজী প্রতিষ্ঠিত আজাদ হিন্দ বাহিনীর কয়েকশো কোটি টাকা মূল্যের অর্থ সম্পত্তি রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যাওয়া নিয়ে এই জওহরলালের দিকেই আজও অভিযোগের আঙুল ওঠে। সোনিয়ার আমলে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের বিরুদ্ধে কয়লাসহ নানাবিধ অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ রয়েছে। সেসব অভিযোগ প্রমাণিতও হয়েছে। সোনিয়া গান্ধীর জামাতা রবার্ট বঢড়ার বিরুদ্ধে জমি কেনাবেচার দুর্নীতির ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। খোদ সোনিয়া এবং সোনিয়া

তনয় রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকার অর্থ নয়ছয়ের অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছে। এই সোনিয়া এবং রাহুলও চাইছেন মোদীকে হঠিয়ে আবার করে কম্মে খাওয়ার রাজ কায়েম করতে।

রইলেন বাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক সময় তিনি পাড়ার মোড়ে মোড়ে সততার প্রতীক কাট আউট লাগিয়ে মানুষের মন ভুলিয়েছিলেন। অবশ্য, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির তিনিই যে এক এবং অদ্বিতীয়ম সৎ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব— তা তো নন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক জগতে আবির্ভূত হওয়ার অনেক আগেই এই রাজ্য ড. প্রফুল্ল ঘোষ, প্রফুল্ল সেন, অজয় মুখোপাধ্যায়, অতুল্য ঘোষ, হরিপদ ভারতী, বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ মুখোপাধ্যায়, মাখন পাল, বিশ্বনাথ মুখ্যোপাধ্যায় --- দক্ষিণ ও বাম দুই রাজনীতিতেই এমন অজস্র সৎ রাজনীতিককে দেখেছেন। এঁদের কারোরই কিন্তু পাড়ার মোড়ে কাট আউট লাগিয়ে সৎ বলে আত্মপ্রচার করতে হয়নি। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তা করতে হয়েছে। কেন করতে হয়েছে, তা বাংলার মানুষ এখন বুঝতে পারছে। বাংলার মানুষ এখন বুঝতে পারছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সততার রাজনীতিটি আসলে একটি ভান। ছ' বছর সরকার চালাতে গিয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেরবার হয়েছেন সারদা, রোজভ্যালি, নারদা কেলেঙ্কারিতে। সততার প্রতীক মুখ্যমন্ত্রীর ভাইবেরাদরদের বিরুদ্ধে নিত্যনতুন তোলাবাজি আর অবৈধ সম্পত্তি বানানোর অভিযোগ উঠছে। এই সমস্ত অভিযোগকে ধামাচাপা দিতে মুখ্যমন্ত্রী দমনপীড়নকেই একমাত্র পন্থা হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

বিরোধী জোটের বর্ণময় চরিত্রদের এই হচ্ছে স্বরূপ। এঁদের কার্যকলাপের ভিতর কোথাও নীতি-আদর্শের কোনো গন্ধ পেলেন? পাবেন না। এঁদের একটিই পলিটিকাল অ্যাজেন্ডা। তা হলো— যে কোনো উপায়ে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী নামক ব্যক্তিটিকে আটকাও। কেন মোদীকে আটকাতে হবে? কেননা, মোদী ক্ষমতায় থাকলে এই করেকম্মে খাওয়া মাসতুতো ভাইবোনদের যে বড়ই দুঃসময়। প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হবার আগে মোদী তিন তিনবার গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও তিনটি বছর পার করে দিলেন। এই দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে মোদীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির সামান্যতম অভিযোগটিও কেউ তুলতে পারেনি। বরং তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে গুজরাতকে ভারতের সফলতম রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন মোদী। তাঁর এই তিন বছরের প্রধানমন্ত্রিত্বকালেও তাঁর এবং তাঁর সরকারের গায়ে দুর্নীতির কোনো ছাপ লাগেনি। বরং, এই তিনবছরেই এক স্বচ্ছ প্রশাসন তিনি উপহার দিয়েছেন দেশবাসীকে। দেশের মানুষ দেখেছে নিছক চটকদারির রাজনীতি না করে, কালো টাকা উদ্ধারের জন্য এই নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী নোটবন্দির মতো সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। দেশের মানুষ দেখেছে, বিরোধী নেতাদের মতো শুধু বাগাড়ম্বর নয়, জন-ধন-যোজনা, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা, অটল পেনশন যোজনা, উজ্জ্বলা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার মতো একাধিক সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প চালু করেছেন এই প্রধানমন্ত্রী। এর সুফলও পাচ্ছে মানুষ। সোনিয়া-মমতা-মুলায়ম- অখিলেশ- লালুপ্রসাদ-সীতারাম- কেজরিওয়ালরা বুঝতে পারছেন, ভারতের রাজনীতিতে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী ক্রমশই তাঁদের অপাংক্তেয় করে তুলছেন। যে চটকদারি ধোকাবাজি, তোষণের রাজনীতি তাঁরা করে এসেছেন এতদিন ধরে— সেই রাজনীতির পরদা যে ক্রমশ ফাঁস হয়ে যাচ্ছে— তা বুঝছেন এই জোটের নেতা-নেত্রীরা। এঁরা এ-ও বুঝতে পারছেন, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে মোদী ফিরে আসবেন ২০১৪-র থেকেও শক্তিশালী হয়ে। তখন তাঁদের অনেককেই হয়তো ইতালি, সিঙ্গাপুর বা নেপালে গিয়ে গা ঢাকা দিতে হবে। শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনটি আসার আগেই বিরোধী নেতা-নেত্রীরা দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে মদত দিতে নেমেছেন। কখনও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারত-বিরোধী ছাত্রনেতাদের পাশে গিয়ে বসছেন রাহুল-সীতরামেরা। কখনো গুজরাতের প্যাটেল আন্দোলনকে উৎসাহ দিতে ছুটে যাচ্ছেন রাহুল। কখনো বা মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানের কৃষকদের খেপিয়ে তুলে রাজনৈতিক মজা লুঠতে চাইছেন।

কিন্তু বিরোধীদের এই মাৎস্যন্যায় সৃষ্টির অপচেষ্টা কি ফলপ্রসূ হবে? ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে এর ফলে কোনোরকম ফায়দা কি তারা লুঠতে পারবে? গত কয়েকমাস আগে অনুষ্ঠিত পাঁচটি রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন দেখে বোঝা গিয়েছে— রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস যতই উস্কানিমূলক রাজনীতি করার চেষ্টা করুন না কেন— ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের পর বিরোধীদের অস্তিত্ব আরোই মলিন হবে। কারণ দেশবাসী ইতিমধ্যেই বুঝিয়ে দিয়েছে, বিরোধীদের সস্তা ঘেশো রাজনীতিতে তারা আর ভরসা রাখে না। তারা ভরসা রাখে মোদীর সমর্থক রাজনীতিতে। সম্প্রতি প্রকাশিত বেশ কয়েকটি জনমত সমীক্ষাতেই দেখা গিয়েছে, জনপ্রিয়তার নিরিখে মোদীই এখন শীর্ষে। তার থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছেন সোনিয়া, মমতা, লালু, অখিলেশ, মুলায়ম, কেজরিওয়ালরা।

মোদীর মেকাবিলা করা যে এ জন্মে তাঁদের কম্মো নয় তা এই বিরোধী জোটের মাসতুতো ভাই-বোনরাও বোঝেন। তাঁরা একে অপরকে জড়িয়ে রয়েছেন অন্য কারণে। যে আর্থিক দুর্নীতিতে এরা সকলেই নিমজ্জিত— তা যে ক্রমশ ফাঁস হয়ে গলায় বসছে— সেটা এঁরা সকলেই অনুধাবন করতে পারছেন। এঁরা এখন চাইছেন— সমস্বরে চেঁচামেচি করে মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে। সমস্যা হচ্ছে, প্রতিমার রঙ চটে খড়ের কাঠামো ইতিমধ্যেই বেরিয়ে পড়তে শুরু করেছে। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে চেঁচামেচি করার জন্য কতজন মাসতুতো ভাই-বোন জেলের বাইরে থাকেন— সেটাই দেখার। ■

গোমাংস ও গবাদিপশু নিষিদ্ধকরণ ও সেকুলার নাটক

অর্ণব কুমার ব্যানার্জী

সম্প্রতি প্রিভেনশন অব ক্রুয়েলটি টু অ্যানিম্যাল আইনের বিধিতে বলা হয়েছে গবাদিপশু কাটার থুড়ি খাওয়ার জন্য বিক্রি করা চলবে না। শুধু চাষের কাজে ব্যবহার করতে হবে। এই নিয়ে এই বঙ্গে মহা হুলুস্থুলু পড়ে গেল। তামাম সেকুলাররা যাদের ফলন এই বঙ্গে বেশি তারা এই বিধির চুলচেরা বিচার করতে লেগে গেল। সেই বিচার মন্থন করে যে কয়েকটি মণিরত্ন উঠে এসেছে তাদের চুলচেরা বিচার করার জন্যই এই নিবন্ধ।

১। এটি অসাংবিধানিক :

রাজ্যের গবাদিপশুর বিক্রয় নাকি সংবিধানের সপ্তম তপসিল অনুযায়ী রাজ্যের ব্যাপার। শুধু রাজ্য সরকার দেখতে পারে। কেন্দ্র সরকার নয়। এই হলো সেকুদের যুক্তি। প্রশ্ন হলো সপ্তম তফসিল আসলে কী? এটি হলো কংকারেন্ট লিস্ট (যুগ্ম তালিকা)। সেটা কী? সংক্ষেপে বলতে গেলে কেন্দ্র ও রাজ্য কোন কোন বিষয়ে আইন পাশ করতে পারে সেই বিষয়ে তিনটে তালিকা বা লিস্ট রয়েছে : সেন্ট্রাল লিস্ট, স্টেট লিস্ট আর কংকারেন্ট লিস্ট। সেন্ট্রাল লিস্টের বিষয়গুলিতে শুধু কেন্দ্র, স্টেট লিস্টের বিষয়গুলিতে শুধু রাজ্য আর কংকারেন্ট লিস্টের বিষয়গুলিতে কেন্দ্র এবং রাজ্য দু'পক্ষই আইন বানাতে পারে। যদি কেন্দ্র ও রাজ্যের আইনের সংঘাত দেখা দেয়, বিশেষ করে একই বিষয়ে যখন দু'পক্ষ আইন বানিয়েছে যা কংকারেন্ট লিস্টের অন্তর্ভুক্ত, নিম্নলিখিত নিয়ম অনুযায়ী বিবাদের নিষ্পত্তি হবে :

যদি কখনো রাজ্যের আইন আর কেন্দ্রের আইনের সংঘাত বাধে অথবা যে আইনের বিষয়বস্তু একই লিস্টে আছে, তাদের মধ্যে সংঘাত বাধে তাহলে কেন্দ্রের আইন জিতবে আর রাজ্যের আইন হারবে। এটাকে বিশ্লেষণ করলে দুটো দিক দেখা যায় :

(ক) কেন্দ্রের আইন আর রাজ্যের আইনের সংঘাত তা সে যে লিস্টের বিষয়ই হোক না কেন।

(খ) কংকারেন্ট লিস্টের বিষয়ে কেন্দ্রের আইন আর রাজ্যের আইনের সংঘাতে কেন্দ্রের আইন জিতবে আর রাজ্যের আইন হারবে। একটা ব্যতিক্রম আছে যদি এই সংঘাত রাজ্যের আইন পাশ হবার আগে ঘটে আর আইন রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায় তখন রাজ্যের আইন জিতবে এবং ওই আইন শুধু ওই রাজ্যেই খাটবে।

এবার আমাদের আইনের দিকে তাকানো যাক। গবাদি পশু নিয়ে দুটো আইন রয়েছে। প্রিভেনশন অব ক্রুয়েলটি টু অ্যানিম্যাল আইন যা কেন্দ্রীয় আইন আর ওয়েস্ট বেঙ্গল কেটল স্লটার আইন যা আদতে রাজ্য আইন। এই দুটো আইনের বিষয় অর্থাৎ গবাদি পশু কংকারেন্ট লিস্টে আছে। এইবার উপরের নিয়েমে ফেলা যাক। কী ফলাফল দাঁড়াবে? নিয়ম অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের আইনি সংঘাতে কেন্দ্রের আইনই জিতবে আর রাজ্যের আইন হারবে। সুতরাং অসাংবিধানিক হলো কী করে? সংবিধানের ব্যাখ্যার তো এটাই নিয়ম। স্পষ্টতই এটা অসাংবিধানিক নয়।

২। এতে রাজ্যের অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে :

এটা আরো সুন্দর। গবাদি পশু বিক্রি করে গরিব চাষিরা নাকি ধনী হয়ে যাচ্ছিল, বিজেপি সরকার তাদের পেটে লাথি মারলো। রাজ্যে নাকি কোটি কোটি টাকার বিফ ইন্ডাস্ট্রি আছে। সেটা নাকি নষ্ট হয়ে যাবে। বাম আমলে ৩৪ বছর ধর্মঘট আর তোলাবাজি করে করে যখন হাজার হাজার শিল্পকে রাজ্যছাড়া করা হয়েছিল তখন কি ইন্ডাস্ট্রি ধ্বংস হয়ে যায়নি? গঙ্গার তীরের হাজার হাজার পাটকল ও চটকল বন্ধ করে দেবার সময় কি জুট ইন্ডাস্ট্রি নষ্ট হয়ে যায়নি? জেসপ, ডানলপ ইত্যাদি বড়শিল্প ধর্মঘট করে বন্ধ করে দেবার বেলায় হেভি ইন্ডাস্ট্রি নষ্ট হয়ে যায়নি? মানুষের রুজি রুটিতে টান পড়েনি? ইন্দোনেশিয়ার সেলিম গ্রুপকে তাড়িয়ে দেবার সময় ইন্ডাস্ট্রি নষ্ট হয়ে যায়নি? মানুষের রুজি-রুটিতে টান পড়েনি? টাটা গোষ্ঠীকে সিঙ্গুর থেকে তাড়িয়ে দেবার সময় অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি নষ্ট হয়নি? ইনফোসিস যখন এই রাজ্য ছেড়ে চলে গেল বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল না পাবার জন্য, তখন আই টি ইন্ডাস্ট্রি নষ্ট হয়নি? মানুষের রুজিতে টান পড়েনি? পড়েছে নিশ্চয়। তাই তো তৃণমূল জমানায় যখন এবিজি গ্রুপ কলকাতা বন্দর থেকে চলে গেল, তখন শ্রমিকরা বিরল নজির গড়লেন স্লোগান তুলে : মন্ত্রী আমরা খাব কী? বাম আর তৃণমূল দুটোই সমান বদ। আর আজ যখন কিছু নিরীহ মূক পশুকে কেবল খাবার জন্য কাটা

হচ্ছে সেইবেলা বিফ ইন্ডাস্ট্রি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

এবার একটা তুলনা করুন : বিফ ইন্ডাস্ট্রি, জুট ইন্ডাস্ট্রি, অটো মোবাইল ইন্ডাস্ট্রি, আই টি ইন্ডাস্ট্রি, হেভি ইন্ডাস্ট্রি, : কোন ইন্ডাস্ট্রি বেশি লাভজনক? জুট, কার, আই টি আর হেভি মেটেরিয়াল ইন্ডাস্ট্রির পাশে কি বিফ ইন্ডাস্ট্রি দাঁড়াতে পারে? অন্তত মার্কেট সাইজ-এর দিক থেকে? কজন বিফ খায় ভারতে? সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা তো কখনই নয়। বাকি রইলো মুষ্টিমেয় সংখ্যালঘু মুসলমান আর খ্রিস্টান। তাহলে এই দেশে বিফের বাজার খুবই কম। অন্যদিকে আই টি, গাড়ি আর জুট প্রোডাক্ট, এইসব কারা ভোগ করে? আপামর ভারতবাসী। তাহলে বাজারের দিক থেকে কোন ইন্ডাস্ট্রি লাভজনক হলো? হেভি মেটোরিয়াল পরিকাঠামো গঠনের কাজে লাগে। সেটার বাজার ভারত এবং বিদেশ দুই জায়গায়

আছে। এটাও লাভজনক বিফের চেয়ে।

বিফ মূলত রপ্তানি নির্ভর শিল্প। এর বাজার ভারতের বাইরে মুসলমান আর খ্রিস্টান দেশগুলিতে আছে। বিফ ইন্ডাস্ট্রি মার খেলে রপ্তানি কিছুটা মার খাবে। কিন্তু দেশের অর্থনীতির কিছু হবে না। কারণ ভারত আরো অনেক কিছু রপ্তানি করে। একটা পণ্য বন্ধ হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

এছাড়াও বিফ ইন্ডাস্ট্রিতে শিক্ষিত ম্যান পাওয়ার নিয়োগ করা হয় না। এটা মূলত অশিক্ষিত কসাইদের উপর নির্ভর করে চলে। সুতরাং দেশের শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের কোনো অসুবিধা নেই এটা বন্ধ হলে।

এখন আবার শোনা যাচ্ছে যে দেশের মাংস বাজার নাকি কোটি টাকার। কার মাংস? মুরগির, পাঁঠার না গোরুর? আবার বলা হচ্ছে চর্মশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ভাবখানা এমন যেন শুধু গোরুর চামড়ার উপরেই চর্মশিল্প দাঁড়িয়ে আছে। লেদারের যে ব্যাগ, জুতো, বেল্ট, জ্যাকেট আমরা ব্যবহার করি সেগুলি বোধহয় শুধু গোরুর চামড়া দিয়েই তৈরি হয়। সবিনয়ে জানাই এমনটা হয় না।

আবার বলা হচ্ছে খাবার উপর নিয়ন্ত্রণ আনা ব্যক্তিস্বাধীনতায় আঘাত। কিন্তু ব্যক্তির কি অসীম স্বাধীনতা আছে? না, নেই। সংবিধানে স্বাধীন অধিকারগুলির কথা খুব বলা হয় কিন্তু সেই অধিকারগুলির সীমা যা সংবিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে সেটা বলা হয় না। যা খুশি তাই খাওয়ার অধিকার কারোর নেই। খাবারটা স্বাস্থ্যকর না অস্বাস্থ্যকর সেটা বিচার করার জন্য দেশে আছে ফুড ডিপার্টমেন্ট যার কাজ হলো স্বাস্থ্যকর খাদ্য সরবরাহ করা। অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার অধিকার কারোর নেই।

তাহলে কাদের অসুবিধা? অসুবিধা ওই অশিক্ষিত মুসলমানদের যারা কসাইয়ের কাজ করে। অসুবিধা তাদের যারা ধর্মের নামে গোহত্যা সমর্থন করছে। অসুবিধা তাদের যারা ওদের ভোটের উপর নির্ভর করে কুর্সিতে বসেছে। অসুবিধা তাদের যারা ওদের উপর কোনো না কোনোভাবে নির্ভরশীল। তাইতো এই সেকুলাররা এত চিৎকার করছে।

৩। জীবিত গোরু মৃত গোরুর চেয়ে দামি :

গোরু ২০ থেকে ২৫ বছর বাঁচে। জ্যান্ত গোরু আপনাকে যতদিন বাঁচে ততদিন দুধ, গোমূত্র, গোবর ইত্যাদি সরবরাহ করে। আপনার খেত চষে দিয়ে আপনাকে সাহায্য করে। মরা গোরু একবারই আপনাকে তার মাংস, হাড় ও চামড়া দেবে। তাহলে লাভজনক কোনটি হলো? জীবিত গোরু বাছুর দিয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। সেই বাছুর আবার আপনাকে দুধ, গোমূত্র ও গোবর দেবে। বস্তুত বাছুর জন্মেই গোমূত্র ও গোবর দিতে শুরু করে, বড় হলে দুধ দেয় ও খেত চষে। সুতরাং আপনার তো লাভ ক্রমাগত বেড়েই চলবে যদি গোরু জীবিত থাকে। মৃত গোরুর ক্ষেত্রে এসবের কোনো প্রশ্নই নেই। তা শুধু একবারই আপনাকে লাভ দেবে। নিজের লাভটা বুঝে চলা উচিত।

অনেকে বলবে গোরু পালন করতে মাসে ৩০০০ টাকা করে খরচ হয়। সেটা চাষিরা করতে পারে না। কিন্তু গোরুর গোবর থেকে সার তৈরি হয়, গোমূত্র থেকে কীটনাশক তৈরি হয়। গোরু নিজেই ট্রাক্টরের কাজ করবে। সেগুলি তো অনেকটা হলেও চাষের খরচ কম। এছাড়া গবাদি পশুপালনের জন্য আনুষঙ্গিক বিভিন্ন শিল্প আছে যেখান থেকে চাষিরা লাভ করতে পারে।

৪। গোহত্যা না করলে গোরুর সংখ্যা বেড়ে গিয়ে মানুষের সঙ্গে সংঘাত হবে...

এটা কিছু পশু বিশেষজ্ঞ বলছেন। এর জবাবে বলা যায় যে আমরা তো কুকুর, বিড়াল, সাপ, ব্যাং অনেকেরই মাংস খাই না। ওদের কি সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে এতটাই যে মানুষের সঙ্গে ওদের সংঘাত লাগছে? আজ্ঞে না। হয়নি। ঈশ্বরের এমনই নিয়ম আছে। পৃথিবীতে প্রাণীদের সংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে মৃত্যু নামে একটা বস্তু যা কসাইখানায় না গেলেও পাওয়া যায়। সেই ন্যাচারাল পথে প্রাণিসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়।

সবশেষে এটাই বলব, গবাদি পশুর হত্যা বন্ধে কেন্দ্র যে নির্দেশিকা জারি করেছে তা অত্যন্ত সময়োপযোগী আর সার্থক হয়েছে।

চীনা যজ্ঞে ভারতের অভিষেক

প্রণয় রায়

বিশ্ব রাজনীতিতে গত কয়েক বছরে এক নতুন উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের যুগ এখন অতীত। আমেরিকা, রাশিয়ার বিশ্ব রাজনীতির উপর প্রভাব ক্রমশ কমছে। আর এখানেই বেঁধেছে গোলযোগ। শূন্যস্থান কে পূরণ করবে। এশিয়ার দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী চীন ও ভারত সম্মুখ সমরে। একদিকে চীনের সমাজতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র, অন্যদিকে ভারতবর্ষের শক্তিশালী গণতন্ত্র।

আটের দশক থেকে চলছিল জোট রাজনীতির স্বর্ণযুগ। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তারা বৈদেশিক রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে দরকষাকষি ছেড়ে জোট ভাঙাগড়ার কাজেই বেশি লিপ্ত ছিল। একের পর এক প্রধানমন্ত্রী বদল হয়েছে সে সময়। মনমোহন-সোনিয়ার রবার স্ট্যাম্প সরকারের দুর্নীতি, শরিক বদল, স্থানীয় দলের দাপট ভারতকে বিশ্ব রাজনীতির আঙ্গিনায় মাথা তুলতে দেয়নি। ঠিক এই সময় চীন তার কমিউনিস্ট একনায়কতন্ত্রের ট্যাঙ্কের নীচে চীনা জনগণের প্রতিবাদী আন্দোলনকে পিষে, গড়ে ফেলল এক শক্তিশালী আগ্রাসী চীনা ড্রাগন।

ভারতীয় গণতন্ত্রে বিরাট পরিবর্তন আসে ১৪ মে ২০১৪। পশ্চিমী সংবাদমাধ্যমের ভাষায় সঠিক অর্থে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির দিন। কেন্দ্রে বিজেপি গড়ল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার। ৩০ বছর পর দেশ পেল স্থায়ী, দৃঢ় সরকার। প্রধানমন্ত্রী হলেন পোড় খাওয়া প্রশাসক নরেন্দ্র মোদী। বিশ্ব রাজনীতির বিশেষজ্ঞরা বলল উন্মত্ত ড্রাগনকে সামলাবে জাগ্রত হাতি। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর একের পর এক বিদেশ সফর চীনা প্রশাসকের রাতের ঘুম কেড়ে নিল। শুরু হলো সেয়ানে সেয়ানে লড়াই। চীন ভারতকে এন এস জি-তে আটকালে ভারতও চীনের প্রতিষ্ঠিত মিসাইল টেকনোলজি কন্ট্রোল রিজিমের প্রবেশ পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

এই অবস্থায় চীনা প্রধানমন্ত্রী তার বিখ্যাত ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড ও ওল্ড সিল্ক রুট-এর মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প ঘোষণা করে বিশ্ব নেতা হওয়ার দাবি পেশ করে। প্রকল্পটির গুঞ্জন শুরু হয়েছিল ২০১৩ সাল থেকেই। প্রথম দিকে ভারতবর্ষও প্রকল্পে উৎসাহ দেখায়। কিন্তু চীন তার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতকে প্রথম থেকেই প্রকল্প থেকে দূরে রাখতে সচেষ্ট হয়। এজন্য তারা প্রকল্পে চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোরকে অন্যতম অংশ বলে ঘোষণা করে। যে করিডোর পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষ তার সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জকারী

এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে মুখ খোলে ও ফোরাম বয়কট করে।

ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড প্রকল্পটা কী?

ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড ও ওল্ড সিল্ক রোড প্রকল্পের মাধ্যমে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপকে জুড়ে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে এই প্রকল্পে। এজন্য গড়ে তোলা হবে :

- ইউরেশিয়ান স্থল ব্রিজ— যা জুড়বে পশ্চিম চীনকে পশ্চিম রাশিয়ার সঙ্গে।
- চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর— যা জুড়বে চীনকে পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে আরব সাগরের সঙ্গে।
- ভারত-বাংলাদেশ-মায়ানমার-চীন রোড লিঙ্ক।
- চীন-রাশিয়া-মঙ্গোলিয়া-রাশিয়া করিডোর।
- চীন-ইন্দোনেশিয়া পেনিনসুলা— অর্থনৈতিক করিডোর।

১৬০ বিলিয়ন খরচের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এশিয়ান ইনফ্রাস্টাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক গড়েছে চীন। যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশীদারিত্ব চীনা সরকারের।

পরিকল্পনাটি উপর উপর দেখলে অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প মনে হলেও এর সামরিক ও কূটনীতিক গুরুত্ব যথেষ্ট। ফলে ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড ফোরামের প্রথম বৈঠক ছিল চীনের কাছে বিশ্ব রাজনীতিতে রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠান। এজন্য চীন আয়োজনের কোনো খামতিও রাখেনি। ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোডের প্রস্তাবিত অংশীদার ছাড়াও সমস্ত বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধান ও বড় বড় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। অনুষ্ঠানের বিশ্বব্যাপী প্রচারে খরচ ছিল কয়েক হাজার কোটি ডলার। এশিয়া ছাড়াও অন্যান্য দেশের মিডিয়াতে বেহিসেবি অর্থ ঢালা হয়েছিল যাতে তারা চীনা সাফল্যের গুঞ্জন সাড়া বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারে। মিডিয়া গুঞ্জনের এক বড় অংশ গিয়েছে ভারতের কিছু মিডিয়া হাউসের কাছেও। ফলে আমাদের চোখের সামনে উঠে আসে চীনা গুণগানের ও ফোরামের সাফল্যের নানা উদাহরণ। কিছু কিছু বোদ্ধা তো আবার ভারতের বয়কটকে নোংরা ভাষায় আক্রমণ হানতেও পিছপা হয়নি। তাদের কথায় ভারত কোণঠাসা হয়ে পড়ল এই মেগা ইভেন্টের বিরোধিতা করে।

এবছরের মে মাসের ১৪-১৫ তারিখে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে চীনের দাবি ২৯টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, ৭০টি দেশের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দল-সহ বিশ্বের তাবড় তাবড় সংগঠনের প্রায় ১৫০০ কর্তা এই কার্যক্রমে অংশ নেয়। চীনা বিদেশমন্ত্রক এও বলে ভারত সরকার এই কার্যক্রমে অংশ না নিলেও ভারতের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি এতে অংশ নেয়। কিছু ভারতীয় মিডিয়া এই খবরে গদগদ হয়ে ভারত সরকারের সমালোচনায় সরব হয়। কিন্তু অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন চীনা বিদেশ মন্ত্রকের করুণ ভাষায় ভারতকে প্রকল্পে যোগ দেওয়ার আহ্বান, চীনা অভিষেকের স্বপ্নভঙ্গের উদাহরণ বলে বিশেষজ্ঞদের মত। চীনা আয়োজকদের কথায় ভারতের যোগদানের শর্তে তারা চীন-পাকিস্তানের অর্থনৈতিক করিডোরের নাম

পাল্টাতেও প্রস্তুত, যে দাবি ভারত আগেই করে রেখেছে।

প্রশ্ন হলো, চীন এতটা নরম হলো কেন? আসলে চীন বুঝতে পেরেছে ভারতকে ছাড়া বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে কোনো মঞ্চের প্রতিষ্ঠা পাওয়া অসম্ভব। আবার সেই মঞ্চে যদি এশিয়ার দেশগুলিকে নিয়ে হয় তবে তার কোনো প্রাসঙ্গিকতাই থাকে না। কারণ ফোরামে সাফল্যের কথা যতই প্রচার করা হোক দেখা যায় ২৯ নয়, ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোডের অংশীদার মাত্র ২০টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানই সম্মেলনে অংশ নিয়েছে। ৯টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান যারা অংশ নিয়েছে তারা হলো ফিজি, সুইজারল্যান্ডের মতো দেশ যারা কোনো ভাবেই এর অংশীদার নয়। অন্য ৪৪টি প্রস্তাবিত ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড ভুক্ত দেশগুলি জুনিয়ার মন্ত্রী বা অফিসারকে পাঠিয়ে দায় সেরেছে। পশ্চিম এশিয়ার কোনো রাষ্ট্রপ্রধানই সেখানে যায়নি। এমনকী ইউরোপ থেকে উল্লেখযোগ্য শুধু ইটালির প্রধানমন্ত্রী। রাশিয়া ছাড়া অন্য তিন ভিটো ক্ষমতাসম্পন্ন সুপার পাওয়ার এই সম্মেলনে অনুপস্থিত। এমনকী বাংলাদেশ, মায়ানমার, মালদ্বীপ, নেপালের মতো দেশও তাদের জুনিয়ার মন্ত্রীদেরই সম্মেলনে পাঠিয়েছে। এশিয়ার আর এক বৃহৎ শক্তি জাপানও সম্মেলনের বাইরে। চীনের বেশির ভাগ প্রতিবেশী রাষ্ট্রপ্রধানও অনুপস্থিত। আফ্রিকার নেতাদের অনুপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। ব্রিক্সস্ ভুক্ত দেশগুলির মধ্যেও ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপ্রধান অনুপস্থিত। জি-২০ দেশগুলির মধ্যে মাত্র চীন-সহ ৬টি দেশ তার প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। পশ্চিমি মিডিয়ার মতে চীনা অনুদানের আগ্রহী দেশগুলিই ফোরামে ভিড় বাড়িয়েছে। যে দেশগুলি যোগ দিয়েছে এদের গড় জিডিপি ১৪৭০০ ডলার আর যে দেশগুলি যোগ দেয়নি তাদের জিডিপি ২৫০০০ ডলার। সবচেয়ে বড় কথা নিউইয়র্ক টাইমসের যে সাংবাদিকটি অনুষ্ঠানের খবর সংগ্রহ করতে গিয়েছিল, তাকেও চীনা বিদেশমন্ত্রক আমেরিকার প্রতিনিধি হিসেবে প্রচার করেছে।

মজার ব্যাপার, প্রায় এই একই সময়ে ভারতের গান্ধীনগরে অনুষ্ঠিত হয় আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের অধিবেশন। বিশ্ব রণনীতির বিশেষজ্ঞরা একে মোদী সরকারের মাস্টার স্ট্রোক হিসেবে দেখছে। প্রথমবার এই অনুষ্ঠানের আফ্রিকার বাইরে আয়োজন ও আয়োজনের সময়টাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ২২ থেকে ২৬ মে আফ্রিকার মোট ৫৪টি দেশ ছাড়াও এতে অংশ নেয় বিশ্বের আরও ২৭টি দেশ।

ফ্রিডম করিডর বৈঠকে জাপ-প্রধানমন্ত্রী ও নরেন্দ্র মোদী।

এর আগেই ভারত ও জাপান মিলেও ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোডের থেকেও বড় পরিকল্পনা ফ্রিডম রোড পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কথা ঘোষণা করেছে। এই সম্মেলনে সবচেয়ে চর্চিত বিষয় ছিল সেটি। এই প্রকল্পে গড়ে উঠবে :

- ফ্রিডম রোড ইরানের চারবাহা বন্দর থেকে শুরু হবে।
- মস্কো-মুম্বই করিডোর গড়া হবে।
- এশিয়ান-আফ্রিকান গ্রোথ করিডোর গড়ে তোলা হবে।
- মেকাঙ্গ-ভারত-অর্থনৈতিক করিডোর গড়া হবে।
- কেনিয়া-তানজেনিয়া-মোজাম্বিক (কে টি এম) লিঙ্ক।
- বাংলাদেশ-মায়ানমার-মালেশিয়া-থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া-ভারত লিঙ্ক।
- ভারতের জামনগর থেকে দিব্যজ্যোতি গাল্ফ অব ইডেন করিডোর।
- মোমবারা-জিনজিবার-মাদুরাই করিডোর।
- কলকাতা-মায়ানমার করিডোর।
- সামুদ্রিক করিডোর যাতে দক্ষিণ আফ্রিকা, মোজাম্বিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়াও অংশ নেবে।

সেই সঙ্গে ভারত-রাশিয়া-ইরান (আই এন এস টি সি) আন্তর্জাতিক উত্তর-দক্ষিণ পরিবহণ করিডোরের কাজ। যা ২০০০ সাল থেকে ভারতের নেতৃত্বে শুরু হয়েছে। প্রকল্পে পরে তুর্কী-সহ মধ্য এশিয়ার আরও ১১টি দেশ যোগ দিয়েছে।

সমস্ত পরিকল্পনার টেকনোলজি জোগাবে জাপান আর ভারত তার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবে বলে ভারত ও অন্য সহযোগী দেশগুলির মধ্যে সমঝোতা হয়েছে।

এখানেই পিছিয়ে রয়েছে চীন। চীন বুঝতে পারছে তার প্রস্তাবিত পথে বেশির ভাগটাই ভারত-জাপান প্রস্তাবিত করিডোরের কিছু অংশ মাত্র। চীনা প্রকল্প আফ্রিকাকে ছুঁয়েছে মাত্র কিন্তু ভারত-জাপান প্রকল্প আফ্রিকার ভেতরে বিরাট করিডোর গড়ে তুলেছে।

রিকানেকটিং এশিয়া প্রজেক্টের ডিরেক্টর জন এথন হিলম্যান বলেছেন, চীনা ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড প্রকল্পের বেশির ভাগ কাজ আগেই শুরু হয়েছে এখানে শুধু নাম বদল করা হয়েছে মাত্র।

এক কথায় বলতে গেলে সদ্য অনুষ্ঠিত ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড ফোরামের ব্যর্থ বৈঠক চীনাদের ভারতকে সমঝে চলার শিক্ষা দিয়ে গেল। ■

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না। টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।
ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

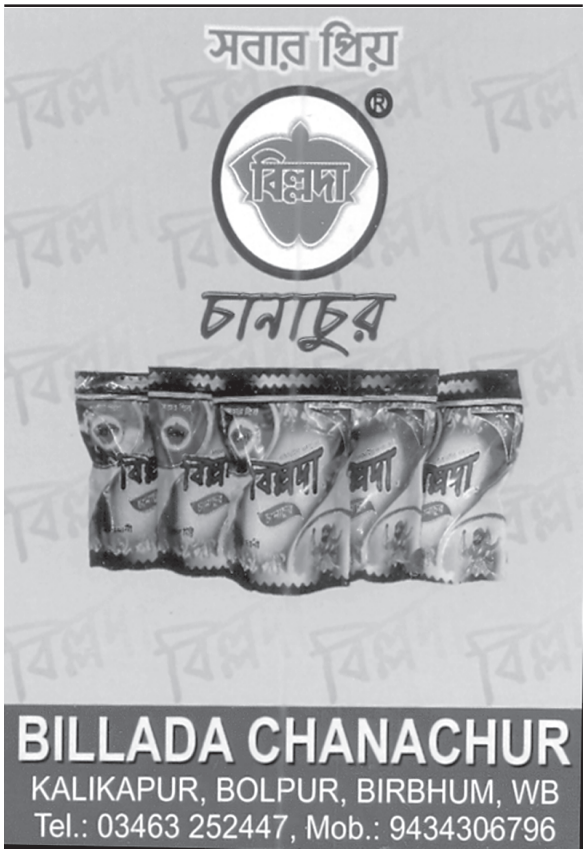

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

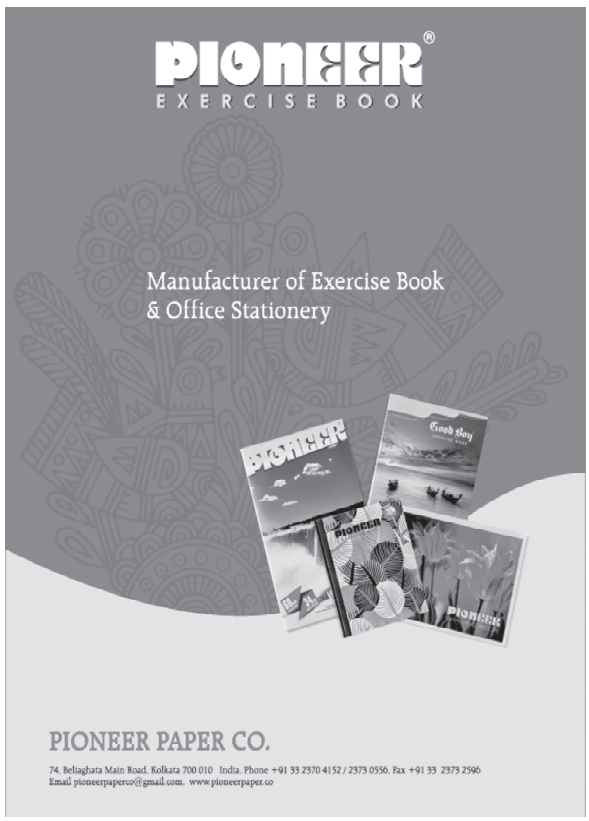

যোগদর্শন বিশ্বমানবের দর্শন

ডাঃ দিব্যসুন্দর দাস

যোগদর্শন হলো বিশ্বমানবের দর্শন। যোগদর্শন শাস্ত্র পড়লে বোঝা যাবে সারা বিশ্বে মানুষ সকাল থেকে সারাদিন ধরে যা করে, যা বলে তা যোগের দর্শনশাস্ত্রের নীতিশিক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। কথায় বলে নরম মাটিকে যেমন ছাঁচে ফেলা যায় তেমনি ধাঁচেই তৈরি হয়। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের মা-বাবা, অভিভাবক, শিক্ষক, কোচ, গাইড, গুরুদেবরা শিক্ষা প্রদান করে থাকেন। যারা এই শিক্ষাকে গুরুত্ব দেন, পালন করেন তাদেরকে সমাজে শিক্ষিত, রুচিসম্মত অভিজাতসম্পন্ন পরিবার বা ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। এহেন ব্যক্তি সমাজের সকলেরই কাছে শ্রদ্ধাশীল ও ভালোবাসার পাত্র হন। এই 'Do's & Dont's' যাকে আমরা যোগের ভাষায় যম এবং নিয়ম বলে অভিহিত করে থাকি, ভারতে যোগী, মুনি, ঋষিরা খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ বছর আগে তা যোগদর্শনের মধ্য দিয়ে চিহ্নিত করে গেছেন। যোগদর্শনে যা যা বলে গেছেন প্রত্যেক সম্প্রদায় তা করে থাকেন বা বলে থাকেন। কারণ এরই মধ্যে জীবনশৈলীর সার্থকতা লুকিয়ে আছে। যোগ কথাটার অর্থও হলো আসল জ্ঞান বা প্রকৃত জ্ঞান বা পারফেক্ট নলেজ। যোগের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে তা বোঝা যায়। ঋষি পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রের প্রবক্তা। তাঁর মতে যোগের সংজ্ঞা হলো— যোগ চিত্ত বৃত্তি নিরোধঃ। অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তিগুলোকে রোধ করতে পারাই হলো যোগ। তাহলে জানতে হবে বৃত্তি কী, বৃত্তি বলতে বোঝায় কার্যক্ষমতা বা কার্যদক্ষতা। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় পাওয়ার অফ অ্যাক্ট বা এবিলিটি বা প্রোপেনসিটি। এই বৃত্তি পাঁচ প্রকার, যথা— প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতি। সংক্ষেপে পড়লেও তা বোঝা যাবে।

প্রমাণ : অর্থে অযথার্থজ্ঞান বা ইমপার্ফেক্ট নলেজ যা যথার্থ জ্ঞান বা সঠিক জ্ঞান নয়। যার দ্বারা প্রমাণ করা অসম্ভব হয়। তাই অযথার্থ জ্ঞান রোধ করে যথার্থ জ্ঞান বা সঠিক জ্ঞানকে উন্মোচন করা প্রয়োজন।

বিপর্যয় : অর্থে মিথ্যা জ্ঞান বা ফলস নলেজ। মিথ্যা জ্ঞান বিপর্যয়ের কারণ হয়। তাই মিথ্যাজ্ঞানকে রোধ করে সত্য জ্ঞানকে প্রকাশ করা বিধেয়।

বিকল্প : পরিবর্তিত জ্ঞান বা অল্টারনেটিভ বা সাবস্টিটিউট নলেজ। প্রকৃত জ্ঞানের বিকল্প জ্ঞান বলে আসল বা রিয়েল জ্ঞান পাওয়া যায় না। আসলের পরিবর্তে নকল দিয়ে কাজ করলে, তা দীর্ঘস্থায়ী এবং যথাযথ হয় না। তাই বিকল্প জ্ঞান গ্রহণ না করে আসল জ্ঞানকে ধরা আসল উদ্দেশ্য।

নিদ্রা : ঘুমন্ত বা অলস জ্ঞান, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় স্লিপিং নলেজ। যে জ্ঞানের প্রখরতা কম, ওপর ওপর জ্ঞান, হলেও হতে পারে, না হলে নয়— এরূপ দুর্বল জ্ঞান, মন্থর জ্ঞান, তাই একে রোধ করে ক্ষিপ্ততা, বলিষ্ঠতা, জ্ঞানের গভীরতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করাই এই জ্ঞানের লক্ষ্য।

স্মৃতি : অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জ্ঞান বা পুরোনো জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি--- যাকে বলা হয় রিকালেকশন অর রিফ্লেক্সশন অফ মেমোরিজ। পুরোনো জ্ঞানকে আঁকড়ে ধরে স্মৃতিমন্থন করে আনন্দ করে লাভ না করে একে রোধ করে বর্তমান জ্ঞান লাভ করা বাঞ্ছনীয়। এতে জ্ঞানের প্রসারতা বাড়ে।

ঋষি পতঞ্জলির মত অনুসারে উপরিউক্ত বৃত্তি থেকে বোঝা যায় যোগ মানে জ্ঞান। এবং তা প্রকৃত ও আসল জ্ঞান। তাই যোগের দর্শন মানে আসল বা প্রকৃত জ্ঞানের দর্শন, তা সহজে অনুমেয়। যোগ দর্শনে ঋষি পতঞ্জলি প্রবর্তিত অষ্টাঙ্গ যোগের কথা উল্লেখিত আছে। এই অষ্টাঙ্গ যোগ অর্থাৎ অষ্ট অঙ্গ হলো যথাক্রমে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি। এর প্রথম দুই ধাপ যম ও নিয়মকে নৈতিক যোগ বা এথিক্যাল যোগ বলা হয়। এগুলো আমাদের নীতিশিক্ষা দেয়। প্রাথমিক স্তর থেকে এই শিক্ষা সকলে লাভ করে থাকে। এটিই হলো বিধি এবং নিষেধ, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'Do's & Dont's'।

অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম ধাপ যম অর্থে সংযম। ভোগ বিষয় থেকে নির্লিপ্ত থাকা অর্থাৎ নিষেধ। সর্ব জাতি, সর্ব সম্প্রদায়ের মা-বাবা অভিভাবকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের এই

যোগ দর্শন অর্থাৎ জ্ঞান দর্শন, বিশেষত সকল মানুষের দর্শন। বিশ্বমানবতার দর্শন। যোগ দর্শন আমাদের জীবনের দর্শন।

শিক্ষাই প্রদান করে থাকেন। নিষেধ বলতে যেমন বোঝায় মিথ্যা কথা বলো না, চুরি করো না। পরের দ্রব্য না বলে নিলে চুরি করা হয়। বেশি কথা না বলা, বাক্ সংযম— বেশি কথা বললে লোকে বাচাল বলে অভিহিত করে থাকে। বেশি খেয়ো না বা উলটো- পালটা জিনিস খেয়ো না--- আহারে সংযম। পোশাক-আশাকে সংযত, রুচিসম্মত পোশাক পরিধান করা প্রয়োজন। কথাবার্তায়, চাল-চলনে সংযত, মার্জিত, রুচিশীলতা সভ্যতার প্রতীক বলে বিবেচিত হয়। তাই যোগের এই ভাবনা শুধু কোনো জাতি বা ব্যক্তি রূপে পরিচিতি লাভ করে। এই সকল যোগের জ্ঞান মানুষকে প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী করে তোলে।

যোগের তৃতীয় ধাপ আসন অর্থে দেহভঙ্গিমা। যে-কোনো ভঙ্গিমায় বসা বা উপবেশন করা, দাঁড়ানো বা শোওয়ার ভঙ্গিমা যোগের আসন বলে পরিগণিত। সকল সম্প্রদায়ের সকল মানুষ, মানুষ অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই এই প্রথা অবলম্বন করতে হয়। বসা, দাঁড়ানো, শোওয়া জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সকল মানুষের প্রয়োজন। এ ভিন্ন উপায় নেই। মানুষকে

সম্প্রদায়ের নয়, সমগ্র বিশ্বের মানুষের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

যোগের দ্বিতীয় ধাপ নিয়ম অর্থাৎ নিয়মানুবর্তিতা বা নিয়মানুসরণ, ইংরেজিতে বলে রুলস্ অ্যান্ড রেগুলেশন ফর সেলফ ডিসিপ্লিন। এটি হলো বিধি বা নিয়ম অর্থাৎ Do's, করতেই হবে, এটি কমপালসরি বা সুনির্দিষ্ট। ছোটোবেলা থেকেই মা-বাবা, অভিভাবকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের বা সন্তানদের স্নান করা, দাঁত মাজা, চুল আঁচড়ানো, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার করা, নোংরা বা বাসী পোশাককে ধৌত করা, পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, নিত্য লেখাপড়া করা, পুজোপাঠ বা উপাসনা করা ইত্যাদি বহুবিধ নিয়ম মানতে বলেন। যম বা সংযমের মতো নিয়মের দশ রকমের নিয়ম বিশ্লেষিত। প্রত্যেক জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে এইসব নিয়েমের প্রথা মেনে চলার নির্দেশ আছে। যারা এই সকল নিয়ম বা কালচার বেশি মেনে চলে তাদেরকে কালচারাল ফ্যামিলি বা কালচার্ড ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত করা হয়ে থাকে। শুধু ধনী ব্যক্তি বা পয়সা বেশি থাকলেই হয় না, শিক্ষিত, জ্ঞানী, রুচিসম্মত, শিষ্টাচারশালী ব্যক্তি জগতে শ্রদ্ধাশীল, প্রণম্য দাঁড়াতেই হবে। প্রয়োজনে বসতে বা শুতে হবে। অবচেতন মনেই আসনের এ সকল ভঙ্গিমা সকল মানুষই করে থাকেন।

যোগের চতুর্থ ধাপ প্রাণায়াম। প্রত্যেক মানুষই তা করে থাকেন। প্রাণবায়ুর আগম ও নির্গম। অর্থাৎ শ্বাস নেওয়া ও ছাড়া করে থাকি। একে আমরা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বলে থাকি। যে শ্বাসবায়ু গ্রহণ করি অর্থাৎ যে শ্বাস দেহের ভিতরে প্রবেশ করে তাকে প্রশ্বাস এবং যে শ্বাস ত্যাগ করি অর্থাৎ নিবিষ্ট বা নিঃশেষিত শ্বাস বা নিঃশ্বাস বলি। প্রাণায়ামের ভাষায় প্রশ্বাসকে পূরক এবং নিঃশ্বাসকে রেচক বলে অভিহিত করা হয়। শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার মাঝখানে দম বন্ধ করে রাখা বা শ্বাস ধরে রাখার প্রথাকে প্রাণায়ামের ভাষায় কুম্ভক বলা হয়। দম বন্ধ সাধারণ অবস্থাতে আমরা করে থাকি। একটা ছিপি খুলতে গেলেও দম বন্ধ করে খুলে থাকি। বডি বিল্ডার বা ওয়েট লিফ্টারও ভারী জিনিস তুলতে গেলে দম বন্ধ করে। তবেই ভারী জিনিস সহজে ওপরদিকে তুলে থাকে। আসলে দম বন্ধ করে বায়ুশক্তিকে আমরা কাজে লাগাই। এই দম বন্ধ করাই হলো প্রাণায়ামের ভাষায় কুম্ভক। চোখ, কান, নাক, জিভ ও ত্বক এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে সংযত করে লোভ, লালসা থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখা বা সংবরণ অনেকেই করে থাকেন। যোগের ভাষায় একে প্রত্যাহার বলা হয়ে থাকে। সমস্ত সেনসরি নার্ভগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে সুসংযত থাকা। এটি যোগের পঞ্চম ধাপ, আমরা অনেকেই অবচেতন মনেই তা পালন করি।

কোনো বিষয়ে একাগ্র চিত্তে মনোনিবেশ করাই হলো ধারণা। যোগের এটি হলো ষষ্ঠ ধাপ। যারা পড়াশুনায় বেশি মনোযোগী, গবেষণা করেন বা কোনো কাজ গভীর চিত্তমগ্ন হয়ে, একাগ্রচিত্তে মনসংযোগ করেন, যোগের ভাষায় একেই বলা হয় ধারণা। খেলাধুলো, গান-বাজনা, পড়াশুনো, চাকরি, ব্যাবসা যে-কোনো প্রফেসনে থাকি না কেন মনের এই একাগ্রতা প্রয়োজন। ইংরেজিতে একে বলা হয় কনসেনট্রেশন। এই একাগ্রতাই মনের চঞ্চলতা, বিক্ষিপ্ততা, অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা, উদ্‌বিগ্নতা কাটিয়ে মনকে একভাবে এক পথে চলতে সাহায্য করে। প্রত্যেক মানুষই যে-কোনো সম্প্রদায়ের হোক না কেন, তাকে এই প্রথা চেতন বা অবচেতন মনে অবলম্বন করতেই হয়। অজান্তেই যোগের এই ভাবগুলো আমরা অভ্যাস করে থাকি।

যোগের সপ্তম ধাপ হলো ধ্যান। যোগের ভাষায় নিমীলিত নয়নে আত্ম নিবিষ্ট হওয়া, ঈশ্বর বা আত্মচিন্তায় মগ্ন হওয়া। ধ্যান মানে চিন্তা করা। প্রতিটি কর্মের ক্ষেত্রে চিন্তাশীল ব্যক্তি গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকেন। গভীর চিন্তায় একভাবে বসে থাকাই হলো ধ্যান। সকল কাজে সকল কর্মক্ষেত্রে আমরা গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকি। অজান্তেই কাজ করতে করতে যোগের ধ্যানই অবচেতন মনে পালন করে থাকি। যোগের ক্ষেত্রে অষ্টম ধাপ সমাধি। ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়া বা বিলীন হওয়া। কর্মক্ষেত্রে যার যার সফলতা তার তার সমাধি বা সাফল্যের শেষ পর্যায় বলা যেতে পারে। তাই বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, যোগের দর্শন আমাদের সকল কর্মের দর্শন, জীবনের দর্শন।

যোগ দর্শন অর্থাৎ জ্ঞান দর্শন, বিশেষত সকল মানুষের দর্শন। বিশ্বমানবতার দর্শন। যোগ দর্শনেও সকল কর্মের সঙ্গে সকাল থেকে বিকেল, রাত্রি পর্যন্ত যা করি, যা বলি সবই যোগের দর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়।

যোগ দর্শন আমাদের জীবনের দর্শন। বিশ্বমানবের দর্শন একথা অনস্বীকার্য। ■

জীবন ও সমাজের মেলবন্ধন করে যোগ

একজন কৃতবিদ্য ইঞ্জিনিয়ার হয়েও যে তিনি যোগাসনকে জীবনে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেন এই ব্যাপারটাই সুবল ঘোষকে তাঁর পারিপার্শ্বিক সমাজে এতটা গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিধাননগর মণ্ডলের একদা সক্রিয় কার্যকর্তা সুবল ঘোষ বর্তমানে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের (বিধাননগর) যোগ- ফিজিওথেরাপি প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মরত। এছাড়া বিধাননগরে আরো কয়েকটি জায়গায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালান। একান্ত সাক্ষাৎকারে যোগাসন ও তার প্রায়োগিক উপযোগিতা সম্পর্কে যুক্তিনিষ্ঠ আলোকপাত করলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বললেন জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

□ যোগাসনে আসার প্রেক্ষাপটটি কী?

● আমি প্রবাসী বাঙালি। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশনে চাকরি নিই। ১৯৬২ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত চাকরি জীবনে সারা ভারত ঘুরেছি। আমাদের কাজে অসম্ভব শারীরিক সক্ষমতা ও মানসিক দৃঢ়তা লাগে। তাই তখনই উপলব্ধি করেছিলাম যোগের মাহাত্ম্যটি। রিটায়ার করে বিহার স্কুল অব যোগ (মুঙ্গের) থেকে শর্টটার্ম কোর্স করি। তারপর বিবেকানন্দ কেন্দ্র ও প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী থেকেও বিশেষ ধরনের কোর্স করে অনেক কিছু শিখেছি। যা পরবর্তীকালে ছড়িয়ে দিয়েছি গুড সামারিটান সেবা প্রতিষ্ঠান এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রে আসা শিক্ষার্থীদের মধ্যে। এখন ৮০ বছরেও যে এতখানি ফিট থেকে সংসার এবং সমাজের কাজ করতে পারছি তার মূলে ওই যোগাসনের সুদৃঢ় ভিত্তি।

□ যোগের শারীরিক এবং সামাজিক কার্যকারিতা সম্পর্কে যদি কিছু বলেন।

● যোগাসন যে শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধিতে সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা নেয় তা আর না বললেও চলে। আজ সারা বিশ্বের মানুষ বুঝেছে সুস্থ ও সুন্দর জীবনচর্চা করতে গেলে প্রতিদিন নিয়ম

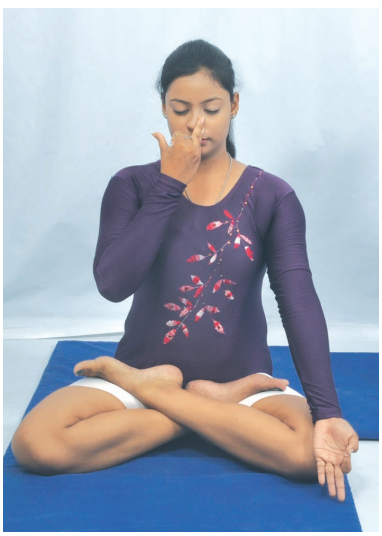

করে যোগাসন করা আবশ্যক। আর যোগাসন যে সামাজিক ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার তা স্বতঃপ্রমাণিত। জাত, ধর্ম, সংস্কৃতির বিভেদ ভুলিয়ে মানবজাতিকে সুশৃঙ্খল বন্ধনে বেঁধে উন্নত সমাজব্যবস্থা গড়তে এর অনস্বীকার্য ভূমিকার কথা ইউনেস্কো বুঝেছে বলেই ২১ জুন দিনটিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের স্বীকৃতি দিয়েছে।

□ আন্তর্জাতিক যোগদিবস বিশ্বব্যাপী যোগের প্রসারে কতখানি সহায়ক ভূমিকা নেবে?

● অনেকখানি। প্রথমত ২০১৫-তে প্রথম যখন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হলো তখন দেখেছি প্রায় দু'শোর মতো দেশের সাধারণ জনমানসে কী বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল। প্রতিবছর যদি এইরকম নিয়ম করে সংগঠিত ভাবে দিনটি পালিত হয়, তবে এর সুফল ফলতে বাধ্য। যোগ অচিরেই বিশ্ব সংস্কৃতি হয়ে উঠবে।

□ যোগাসন কি দেশে-বিদেশে স্কুলস্তরে আবশ্যক পাঠক্রম হওয়া উচিত?

● অবশ্যই। স্কুলস্তরে ঐচ্ছিক নয়, আবশ্যিক পাঠক্রম হওয়া উচিত। তাহলে শিশু বয়স থেকেই ছেলে-মেয়েদের শরীর-মন তৈরি হয়ে যাবে। জীবনে শৃঙ্খলা ও সংস্কার গড়ে উঠবে। আদর্শ নাগরিক হয়ে উঠবে। সব মিলিয়ে যোগের মাধ্যমে সব দেশে মানুষ ও সভ্যতার মধ্যে সত্যনিষ্ঠ মেলবন্ধন গড়ে উঠবে। এই বসুন্ধরা সমস্তরকম সঙ্কট থেকে মুক্তি পাবে এবং স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন 'সত্যমেব বসুন্ধরা' বাস্তব রূপ পাবে। ■

ভারতীয় যোগের সফলতম দূত নরেন্দ্র মোদী ও বাবা রামদেব

যোগের জয়গানে মুখরিত বিশ্ব

চন্দ্রভানু ঘোষাল

২১ জুন আসতে আর বেশি দেরি নেই। ২০১৫ সালে এই দিনটিকে রাষ্ট্রপুঞ্জ আন্তর্জাতিক যোগদিবস হিসেবে ঘোষণা করেছিল। বস্তুত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরেই নরেন্দ্র মোদী ভারতীয় যোগকে দেশ-বিদেশের সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে পৌঁছে দেবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন। বছরের একটা বিশেষ দিনকে আন্তর্জাতিক যোগদিবস হিসেবে পালন সেই সঙ্কল্পেরই অঙ্গ। প্রথম ও দ্বিতীয় যোগদিবসে বিশ্বের ১৯০টি দেশের মানুষ নরেন্দ্র মোদীর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। এর মধ্যে ছিল বেশ কয়েকটি ইসলামিক দেশও। আফগানিস্তান, ইরাক, বাংলাদেশ সৌদি আরবের মৌলবাদীরা যোগকে হিন্দু ধর্মের অংশ হিসেবে জাহির করে মুসলমানদের দূরে থাকার ফতোয়া দিলেও কার্যক্ষেত্রে তা ফলপ্রসূ হয়নি। যোগের সঙ্গে ধর্মের যে কোনো সম্পর্ক নেই, যোগ যে শারীরিক ও মানসিক উত্তরণের একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম, তা বিশ্বের মানুষ বুঝতে পেরেছেন। সেই কারণেই বিশ্বজুড়ে মানুষের এই বিপুল উন্মাদনা।

যোগের প্রচার ও প্রসারে নরেন্দ্র মোদী ছাড়া আর যার অবদান অনস্বীকার্য, তিনি বাবা রামদেব। সাধারণ অসুখ-বিসুখ থেকে শুরু করে দুরারোগ্য ব্যাধি পর্যন্ত— প্রতিটি ক্ষেত্রে যোগ কতদূর পর্যন্ত ফলপ্রদ হতে পারে তা সাধারণ মানুষ জানতে পেরেছেন বাবা রামদেবের কাছ থেকে। তিনি সন্ন্যাসী। তাঁর পোশাকের রঙ গেরুয়া। এই রঙ আজও ভারতবর্ষ-সহ সারা বিশ্বের বিশ্বাসের ভিত্তি নির্মাণে সক্ষম। মানুষ তাকে বিশ্বাস করে। ঠিক যেমন করে নরেন্দ্র মোদীকেও। এঁদের মূল উদ্দেশ্য মানুষের মঙ্গলসাধন। তার জন্য একজন বেছে নিয়েছেন রাজনীতিকে আর অন্যজন বাণিজ্য ও বিপণনকে।

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে বাবা রামদেবের সঙ্গে যোগাভ্যাস করতে দেখা গেছে। তৃতীয় আন্তর্জাতিক যোগদিবসের প্রাকপর্বে সম্ভবত এটাই সব থেকে বড়ো খবর। কেন্দ্রীয় সরকার যোগকে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান। এ বছরের যোগদিবসের প্রধান অনুষ্ঠানটি হবে উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌয়ে। অংশ নেবেন যোগের

চণ্ডীগড়ে যোগদিবসে নরেন্দ্র মোদী।

লক্ষ্ণৌ-এ যোগাভ্যাসে বাবা রামদেব এবং যোগী আদিত্যনাথ।

যোগদিবসে তামিলনাড়ুতে যোগাভ্যাস।

সঙ্গে যুক্ত ৫১,০০০ মানুষ। আয়ুশ- দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপাদ মালিক বলেছেন, 'এবারের যোগদিবসে বিশ্বের প্রতিটি দেশ অংশ নেবে। ভারতীয় দূতাবাসগুলি সমস্ত অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও পরিচালনা করবে।' কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিটি রাজ্য সরকারকে যোগদিবস পালন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এনজিও এবং স্কুলগুলিও যে-যার মতো দিনটি পালন করবে। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যোগদিবসের উদ্দেশ্য যেহেতু সব মানুষের মঙ্গল তাই কারও ওপর চাপ সৃষ্টি করা সরকারের লক্ষ্য নয়।

তৃতীয় আন্তর্জাতিক যোগদিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার বেশ কয়েকটি ঘোষণা করেছে। তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো সারা দেশে সরকারের তত্ত্বাবধানে থাকা ১০০টি পার্ক যোগের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি ও সংস্থার হাতে সমর্পণ। এছাড়া দেশে-বিদেশে যারা যোগের প্রচার ও প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর তাদের পুরস্কৃত করবে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবারের যোগদিবসে অংশগ্রহণকারী দেশের সংখ্যা গত দু'বারের থেকে বাড়বে বলে মনে করছে সরকারি মহল। চীনের ঝিজিয়াং প্রদেশে ভারতীয় দূতাবাদ এবং উই কাউন্টির প্রাদেশিক সরকার যৌথভাবে পালন করবে দিনটি। অংশ নেবেন সহস্রাধিক মানুষ। চীনের মতো নিউইয়র্কের টাইমস স্কোয়ার, লন্ডনের পিকাডিলি সার্কাস, ফ্রান্সের ইফেল টাওয়ার সংলগ্ন অঞ্চলে সাড়ম্বরে উদযাপিত হবে যোগদিবস।

অভূতপূর্ব আনন্দ আর উদ্দীপনায় প্রহর গুণছে সারা দেশ, সারা বিশ্ব। কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রেডিয়োর মন কি বাত অনুষ্ঠানে 'সেলফি উইথ ডটার' ক্যাম্পেনের কথা বলেছিলেন। তাতে মিলেছে অভূতপূর্ব সাড়া। সোশ্যাল মিডিয়া ভরে গেছে তিন প্রজন্মের (দাদু-দিদা, বাবা-মা, ভাই-বোন) যোগচর্চার ছবিতে। এটা যদি পূর্বাভাস হয় তা হলে নিশ্চিত ২০১৫ ও ২০১৬-র মতো ২০১৭-র যোগদিবসেও সারা বিশ্ব ভারতের জয়গানে মুখরিত হবে। প্রমাণিত হবে, অবশিষ্ট পৃথিবী আজও যার সন্ধান পায়নি, ভারত তা ৫০০০ বছর আগেই পেয়ে গিয়েছিল। ■

বিদেশের মাটিতে যোগ

আমেরিকা

সৌদি আরব

মেক্সিকো

লন্ডন

অস্ট্রেলিয়া

নেপাল

ইন্দোনেশিয়া

চিন

মালয়েশিয়া

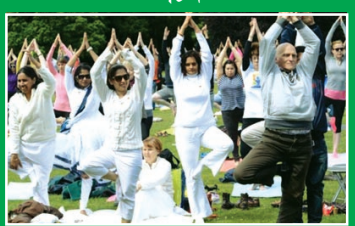

আয়ারল্যান্ড

এই সময়

রসিক সুষমা

বিদেশে কেউ বিপদে পড়লে সুষমা স্বরাজের শরণাপন্ন হন। তিনি উপায় বাৎলে দেন। সম্প্রতি এক ভদ্রলোকের টুইটার-রসিকতা : 'মঙ্গলগ্রহে আটকে পড়েছি। মঙ্গলযান যে খাবার এনেছিল সব শেষ। আমাকে বাঁচান।' সুষমার জবাব, 'মঙ্গলগ্রহের ভারতীয় দূতাবাসে যোগাযোগ করুন।'

অজাচার

পোষ্যকে ঠিকমতো খেতে না দিলে কী হয় তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন

উত্তরপ্রদেশের সর্বেশকুমার পাল। খিদে সহ্য করতে না পেরে তার পোষা ছাগল ৬২০০০ টাকার নোট খেয়ে ফেলেছে। প্যান্টের পকেটে টাকা রেখে সর্বেশ স্নানে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন এই কাণ্ড!

ব্যাগে কুকুর

নিউইয়র্কের সাবওয়েতে কুকুর নিয়ে ঢোকা নিষিদ্ধ হলো। ব্যাগে ভরে নিয়ে গেলে অবশ্য কোনো অসুবিধে নেই। সম্প্রতি এক যাত্রী একটি ছবি টুইট করেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে ব্যাগবন্দি কুকুর মালিকের কোলে চেপে ঘুরছে।

সমাবেশ -সমাচার

নাগপুরে তৃতীয়বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গের সমাপ্তি

গত ১৫ মে নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ শুরু হয়ে বর্গের সমাপ্তি হয় গত ৭ জুন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ড. মোহনরাও ভাগবত এবং প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন নেপালের প্রাক্তন সেনা প্রধান রুকমাঙ্গদ কাটাওয়াল।

প্রতি বছর দেশের নির্বাচিত কার্যকর্তাদের নিয়ে সঙ্ঘের এই তৃতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ অনুষ্ঠিত হয়। দেশের সবকটি রাজ্য থেকে ৯০৩ জন কার্যকর্তা এবছর বর্গে অংশ নিয়েছেন। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে অংশ নিয়েছেন ৪১ জন কার্যকর্তা।

বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সরসঙ্ঘচালক স্বয়ংসেবক ও উপস্থিত নাগরিকদের উদ্দেশে বলেন— 'বিশ্বকে দিশা দেখানোর জন্য ভারত আগামীদিনে বিশ্বগুরুর আসন নেবে। বিশ্বগুরুর আসন গ্রহণ ভারতের দৈব কর্তব্য। কারণ বিশ্বে ভারতই একমাত্র শান্তি ও মৈত্রীর উদাহরণ রাখতে সমর্থ হয়েছে।' এ প্রসঙ্গে তিনি প্যারিস ক্লাইমেট সামিটের উল্লেখ করে বলেন— 'বিশ্ব মঙ্গলের জন্য ভারত নিজের স্বার্থের সঙ্গে আপোশ করেছে এবং আগামী দিনে প্রয়োজনে নিজেকে সুপার পাওয়ার হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করবে।

সঙ্ঘের বিশেষ প্রশিক্ষণ বর্গের সমাপ্তি

গত ১০ জুন বিকালে মুর্শিদাবাদ জেলার কাশিমবাজার সরস্বতী শিশু মন্দির সংলগ্ন মাঠে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিশেষ প্রথম বর্ষ সঙ্ঘশিক্ষা বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয়। একুশ দিন ব্যাপী এই শিবির শুরু হয় ২১ জুন। দক্ষিণবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও সিকিম প্রান্ত থেকে প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা গ্রহণের জন্য ৪০ থেকে ৬৫ বছর বয়সের স্বয়ংসেবকদের শুধু এই শিবিরে যোগদানের অনুমতি ছিল। সঙ্ঘের রীতি অনুযায়ী ধ্বজোত্তোলন ও প্রার্থনার পর শিক্ষার্থী স্বয়ংসেবকরা দণ্ড, ব্যায়াম, আসন প্রভৃতি শারীরিক কার্যক্রম প্রদর্শন করে। সমবেত গীত গায়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক ড. গৌতম ভৌমিক। শিক্ষার্থীদের পথনির্দেশ করে ভাষণ দেন বর্গাধিকারী অসিত খামারি। বর্গের কার্যবাহ তরুণ লায়েক শিবিরের প্রতিবেদন দিতে গিয়ে জানান, এই বর্গে ২২৩ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেমন অধ্যাপক-শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রযুক্তিবিদ প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার মানুষ রয়েছেন, তেমন কৃষক-শ্রমজীবীরাও রয়েছেন। সঙ্ঘের কাজ— ব্যক্তি নির্মাণের মাধ্যমে হিন্দু

এই সময়

টেরেসার প্রতিশ্রুতি

সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার জন্য দরকার হলে ব্রিটেনের মানবাধিকার আইনের

সংশোধন করা হবে। নির্বাচনের প্রাকপর্বে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টেরেসা মে। ব্রিটেনে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতেই এই প্রতিশ্রুতি বলে মনে করছেন সকলে।

মাতৃ অমৃত

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব সি.কে. মিশ্র সম্প্রতি দিল্লির লেডি হার্ডিঞ্জ

মেডিক্যাল কলেজে জাতীয় মাতৃদুগ্ধ ব্যাঙ্ক এবং স্তন্যপান সংক্রান্ত কাউন্সেলিং সেন্টারের উদ্বোধন করেছেন। মাতৃদুগ্ধ ব্যাঙ্কের নাম দেওয়া হয়েছে বাৎসল্য মাতৃ অমৃতকোষ।

নাগাজঙ্গি নিহত

ন্যাশনাল সোশালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড (খাপলাং গোষ্ঠী)-র তিনজন জঙ্গি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে

নিহত হয়েছে। শহিদ হয়েছেন অসম রাইফেলের এক জওয়ানও। লাপ্পার কাছে সংঘর্ষের সময় তিনি মারা যান বলে জানিয়েছে পিটিআই।

সমাবেশ -সমাচার

সমাজ সংগঠনের আবশ্যিকতা, বিশেষত বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তা বিভিন্ন উদাহরণ-সহ তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু। এই দিনের অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের প্রবীণ অধিকারীদের মধ্যে উপস্থিত

ছিলেন সঙ্ঘের প্রাক্তন সর্বভারতীয় প্রচারক প্রমুখ শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ, অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী মণ্ডলের সদস্য সুনীল গোস্বামী, অখিল ভারতীয় সহ-প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত, পূর্ব ক্ষেত্র কার্যবাহ গোপালভাই, দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুল বিশ্বাস, দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখার্জী প্রমুখ। উল্লেখ, এই শিবিরের পরিবেশটি ছিল আন্তরিকতায় ভরা। শিক্ষার্থী-শিক্ষক- ব্যবস্থাপক-আধিকারিকদের আন্তরিকতার এই মেলবন্ধন সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সংস্কৃতভারতীর আবাসীয় প্রশিক্ষণ বর্গ

গত ১ থেকে ১১ জুন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার নৈহাটির হালিশহরে শ্রীশ্রী নিগমানন্দ সারস্বত মঠে সংস্কৃতভারতী দক্ষিণবঙ্গের এক আবাসিক সংস্কৃত প্রশিক্ষণ বর্গের আয়োজন করা হয়। বর্গে ৭৮ জন শিক্ষার্থী এবং ৩৬ জন প্রবন্ধক অংশগ্রহণ

করেন। বর্গের উদ্ঘাটন করেন মঠের মহান্ত স্বামী জ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহারাজ, সংস্কৃতভারতীর উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের ক্ষেত্রসংগঠন মন্ত্রী ডাঃ সঞ্জীব রায়, হাওড়া সাহিত্য সমাজের সম্পাদক ডাঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। বর্গে বর্গাধিকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার।

মঠের মহান্ত মহারাজ সংস্কৃতভারতীর পত্রাচার দ্বারা সংস্কৃত শিক্ষণ যোজনার শিক্ষা বইটির উদ্ঘাটন করেন।

এই সময়

ব্রাত্য কাতার

কাতারের সঙ্গে ৭টি আরব দেশের সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণ সন্ত্রাসবাদ নয়,

প্রাকৃতিক গ্যাস। এমনটাই মনে করছেন আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক মহল। উল্লেখ্য, আল কায়দাকে এক হাজার কোটি মার্কিন ডলার অনুদান দেওয়ার অভিযোগে কাতারকে একঘরে করেছে আরব দুনিয়া।

ছাত্র থেকে সাধু

এবছর দ্বাদশ শ্রেণীর বোর্ড-এর পরীক্ষায় সুরাটের বর্ষিল শাহ ৯৩.০৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছে। তবে সিএ বা এমবিএ ডিগ্রি লাভের দৌড়ে সে নেই। সে এক জৈন মুনির কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চায়। এই সংকল্পে তাঁর পরিবারেও সম্মতি আছে।

নিষিদ্ধ বইয়ের সৌধ

সম্প্রতি জার্মানির বৃহত্তম শিল্পমেলায় 'দি পার্থিনন অব বুকস' নামে একটি

শিল্পসৌধের উদ্বোধন হয়েছে। গ্রিক পার্থিনিয়ন মন্দিরের আদলে এটা তৈরি হলেও তা মার্বেল পাথর দিয়ে নয়— নিষিদ্ধ সব বইয়ের সংগ্রহ দিয়ে তৈরি। এই শিল্পসৌধটি ঠিক সেই জায়গাতেই তৈরি করা হয়েছে যেখানে নাৎসিরা ইহুদিদের সব বই পুড়িয়ে দিয়েছিল।

সমাবেশ -সমাচার

সংস্কার ভারতীর বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ১১ জুন সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১৬-২০১৭ অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার বড়বাজার লাইব্রেরিতে। রবিবার সকালে উদ্বোধনের পর সংস্কার

ভারতীর অখিল ভারতীয়-সহ সংগঠন সম্পাদক পি. আর. কৃষ্ণমূর্তি, পূর্বক্ষেত্রের সংগঠন সম্পাদক নিরঞ্জন পণ্ডা, পূর্বক্ষেত্র প্রমুখ অধীর রায় এবং অন্যান্য বিশিষ্ট কার্যকর্তার উপস্থিতিতে বার্ষিক সাধারণ সভার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াটি শুরু হয়। বিকাশ ভট্টাচার্য কর্তৃক পরিচালিত নির্বাচন পর্বের মধ্য দিয়ে ২০১৭-১৮ বর্ষের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হন যথাক্রমে তপন গাঙ্গুলী, ভরত কুণ্ডু ও গোপাল কুণ্ডু। যুগ্ম সংগঠন সম্পাদক হিসেবে নিখিল সমাদ্দার ও তিলক সেনগুপ্ত'র নাম ঘোষিত হয়। সহ-সংগঠন সম্পাদকের দায়িত্বে আসেন শুভঙ্কর মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত, নাট্য, নৃত্য, অঙ্কন, মাতৃশক্তি বিভাগ ও কার্যালয় প্রমুখ, সদস্য ও পৃষ্ঠপোষক এবং উপদেষ্টামণ্ডলীর তালিকাটি ঘোষণা করেন সাধারণ সম্পাদক। বিশেষ উল্লেখনীয়, এই বছরে বিশিষ্ট সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য এবং বিশিষ্ট লেখক গুরু বিশ্বাস, শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায় ও আশিস কর্মকার প্রান্তের সহ-সভাপতির পদে মনোনীত হন। আগামী ২৮, ২৯, ৩০ অক্টোবর হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে অনুষ্ঠিতব্য অখিল ভারতীয় কলা সাধক সঙ্গমের বিষয়ে ২০১৭-১৮ অনুষ্ঠিতব্য প্রাদেশিক শিল্পী সম্মেলনের প্রাথমিক রূপরেখা, সাংগঠনিক আলোচনা হয়। সভায় প্রান্তের ২৬টি স্থান থেকে ৯৭ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভা বিকেলে সমাপ্ত হয়।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মার্গদর্শক মণ্ডলীর বৈঠক

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় মার্গদর্শক মণ্ডলীর বৈঠক হরিদ্বারে উদাসীন কার্ষি নারায়ণ আশ্রমে গত ৩১ মে থেকে ২ জুন অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে পরিষদের পদাধিকারীরা ছাড়াও বহু পূজ্য সন্ত উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকে শ্রীরামজন্মভূমি, সামাজিক সমরসতা এবং

গোরক্ষা নিয়ে মোট তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়— (১) শ্রীরামমন্দির নির্মাণের জন্য আইন প্রণয়ন (২) সামাজিক সমরসতা এবং (৩) গোরক্ষা।

বিগত তিন বছর ভারতব্যাপী শুরু হয়েছে মফস্‌সল শহরগুলির এক নবজাগরণ

অতিথি কলম

বেঙ্কাইয়া নাইডু

একদিন সকালবেলা রাজস্থানের প্রত্যন্ত শহরতলি যেখানে মাত্র ১ লক্ষ ১৯ হাজার লোকের বাস, সেই ঝুনঝুনুর নগর পঞ্চায়েত প্রধানের কৌতূহল হলো তাঁর অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ই বা কত আর সেই আদায়-সংক্রান্ত প্রকার-পদ্ধতিই বা কী? এই সব মারপ্যাঁচ জানবার এখনকার সহজতম পদ্ধতি হচ্ছে Credit Rating করিয়ে নেওয়া। প্রধানও তাই করলেন। গত মার্চ মাসে এই ক্ষেত্রে তাঁর অঞ্চলের অবস্থান হলো 'A' যা বেশি চালু BBB গ্রেড-এর পাঁচ মাত্রা ওপরে।

ঝুনঝুনর মতো অজ্ঞাত এক অঞ্চল অন্ধ্রপ্রদেশের কুরনুল, কর্ণাটকের বেলাগাঁও বা তুলনায় বেশি পরিচিত ওড়িশার কটক বা ঝাড়খণ্ডের রাঁচীর সঙ্গে এক পঙতিতে উঠে এসেছে। ভারতের ২০০টি শহর ও শহরতলির সঙ্গে ঝুনঝুনের মতো অঞ্চল মূল্যায়নের মাপকাঠিতে বিনিয়োগের উপযুক্ত হওয়ার তকমা আদায় করে নিয়েছে। এই মানদণ্ডে নিউ দিল্লি নগর পালিকা, নবি মুম্বই ও পুনে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে। তারা AA+ গ্রেড পেয়েছে।

এই মানদণ্ডগুলি উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে ২০টি শহর ইতিমধ্যেই তাদের তরফে মিউনিসিপ্যাল বন্ড বাজারে ছাড়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এই বন্ড বিক্রি খাতে সংগৃহীত অর্থ শহরের পরিকাঠামো উন্নয়নের মতো জরুরি প্রয়োজনে বিনিয়োগ হতে চলেছে। স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথে এ এক নতুন পদক্ষেপ। ২ বছর আগে শুরু হওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের নিউ আর্বান মিশন প্রকল্পের আওতায় এই কর্মকাণ্ড চলছে। এই প্রকল্পের রেশ ধরেই সিনেমার ট্রেলারের মতো বোঝা যাচ্ছে ভারতব্যাপী শহর-শহরতলিগুলিতে কী পরিবর্তন সাধিত হয়ে চলেছে।

শহর ও শহরতলির নবজাগরণের বিষয়টি কতদূর অগ্রসর হয়েছে তার প্রমাণ স্বরূপ নীচের উদাহরণটিই যথেষ্ট। অসমের ডিব্রুগড়, বিহারের বেগুসরাই, ছত্তিশগড়ের অম্বিকাপুর, উত্তরপ্রদেশের বাহরিচের মতো ৫০০টি শহর দেশের ইতিহাসে এই প্রথম নির্দিষ্ট ৫ বছরের প্রকল্প নিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করে চলেছে। যার ফলে বুনিয়াদি পরিকাঠামোগত উন্নতি অর্থাৎ প্রত্যেক ঘরে জলের সরবরাহ যা পরিবার পিছু বর্তমানে চালু ১৩৫ লিটারের মাত্রাকে সাহায্য করবে। শহরের নিকাশি ব্যবস্থা ও নালাগুলির সংস্কার ছাড়াও অটল মিশন ফর রিজুভিনেশন অ্যান্ড আর্বান ট্রান্সফর (AMRVT)-এর অধীনে যন্ত্রচালিত নয় এমন পরিবহণগুলির উন্নতি সাধনের পাশাপাশি এলাকার বিভিন্ন স্থানকে জনগণের ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার প্রকল্পগুলি পুরোদমে চলছে। মোট ৭৮ হাজার কোটি টাকা প্রকল্প খরচের মধ্যে কেন্দ্রের দেয় ৩৭ হাজার কোটি টাকা। শহরকেন্দ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে নতুন ভাবনায় রূপ দিতে অন্ধ্রপ্রদেশের দেবস্থান তিরুপতি, রাজস্থানের মুসলিম তীর্থ আজমের, ভ্রমণ পিপাসুদের প্রিয় আগরার মতো ৬০টি শহরকে বেছে নিয়ে ৫ বছর মেয়াদি স্মার্ট সিটি প্রকল্পের কাজ চলছে। প্রত্যেকটি শহর পিছু ২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

শহরকেন্দ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে নতুন ভাবনায় রূপ দিতে অন্ধ্রপ্রদেশের দেবস্থান তিরুপতি, রাজস্থানের মুসলিম তীর্থ আজমের, ভ্রমণ পিপাসুদের প্রিয় আগরার মতো ৬০টি শহরকে বেছে নিয়ে ৫ বছর মেয়াদি স্মার্ট সিটি প্রকল্পের কাজ চলছে। প্রত্যেকটি শহর পিছু ২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

এই প্রকল্পের কাজে বিশেষ প্রাধান্য দিতে এগুলিকে Special Purpose vehicles incorporated under the companies Act of 2013-এর আওতাধীন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য যাতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রকল্পগুলি রূপায়ণ করা যায়। এ পর্যন্ত নির্বাচিত এই ৬০টি শহর তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বাবদ ১ লক্ষ ৩৪ হাজার কোটি টাকা লগ্নির প্রস্তাব দিয়েছে যার মধ্যে কেন্দ্রের ভাগ ৩০ হাজার কোটি টাকা। এতকাল চালু থাকা অ্যাডহক সিস্টেমে কাজ করার চিরাচরিত গয়ংগচ্ছ নীতির থেকে বেরিয়ে এসে AMRUT প্রকল্প ও স্মার্ট সিটি প্রকল্পের কাজ বর্তমানে সম্পূর্ণ তথ্য নির্ভর ও সবচেয়ে প্রমাণ্য। পরিকাঠামো ক্ষেত্রের সার্বিক উন্নতি সংক্রান্ত প্রকল্পগুলি রূপায়িত হয়ে গেলে দেশের শতকরা ২০ শতাংশ শহরে জনগণই এক উন্নততর জীবনযাত্রার পরিচায়ক হয়ে উঠবেন।

আমাদের দেশের একটি অতি সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও উত্তরাধিকার রয়েছে। এই উভয়েরই সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন। ঐতিহাসিক সৌধগুলির মোটিভগুলির (Heritage Structure) পূর্ণ সংস্কার ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে অমৃতসর, মথুরা, বারাণসী, গয়া, দ্বারকা, ওয়ারাঙ্গাল (তেলেঙ্গানা) এবং ভেল্লানকিনি (তামিলনাড়ু) প্রভৃতিকে Heritage Development & Augmentation Yojana (HRIDAY) যোজনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মাপকাঠিতে অনেক ওপরে উঠে

এসেছে এইসব তীর্থ শহরগুলি। যথার্থ শহুরে ভারত, ঝকঝকে ভারত হয়ে ওঠার পথচলায় এক উথাল-পাথাল যে চলছে তা আর বলে দিতে হয় না।

বিগত দু' বছরে নতুন 'আর্বান মিশন' প্রকল্প চালু হওয়ার ক্ষেত্রে এ যাবৎ চালু থাকা দিল্লি থেকে প্রকল্প নির্ধারণ করে চাপিয়ে দেওয়ার প্রথা (Top Down approach) থেকে সরে আসা হয়েছে। পরিবর্তে দেশের নগরায়ণের প্রক্রিয়াকে সার্থক ও ফলপ্রসূ করতে রাজ্যগুলিকে একেবারে নীচু স্তরে গিয়ে তার শহরগুলির কোন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রয়োজন তার রূপরেখা তৈরি করতে বলা হয়েছে। এর ভিত্তিতে অনুমোদন ও বিনিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে। এই নিচু থেকে উন্নয়নের (bottom up) নীতি অসামান্য সাফল্য নিয়ে এসেছে। আনুমানিক আড়াই কোটি নাগরিক এই স্মার্ট সিটি প্রকল্পে সরাসরি তাদের মতামতের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেছেন। এই 'টিম ইন্ডিয়া' ভাবনার প্রয়োগে খুব কম সময়ের মধ্যে ৪.৫০ লক্ষ কোটি টাকা শহরগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যয়িত হয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেহেতু মূলত শহরকেন্দ্রিকতার ভিত্তিতেই অগ্রসর হয় এবং এর ফলে শহরে 'Case of doing business' অর্থাৎ ব্যবসা করার স্বাচ্ছন্দ্য যাতে

অটল মিশন ফর রেজুভিনেশন অ্যান্ড আরবান ট্রান্সফরমেশন, সংক্ষেপে অমরুত প্রকল্পের আওতায় কোন রাজ্যে কতগুলি স্মার্ট সিটি

উত্তরপ্রদেশ	—	৬৪
তামিলনাড়ু	—	৩৩
মহারাষ্ট্র	—	৩৭
গুজরাট	—	৩১
কর্ণাটক	—	২১
অন্ধ্রপ্রদেশ	—	৩১
রাজস্থান	—	৩০
পশ্চিমবঙ্গ	—	২৮
বিহার	—	২৭
ওড়িশা	—	১৯
হরিয়ানা	—	১৯
কেরল	—	১৮
পঞ্জাব	—	১৭
তেলেঙ্গানা	—	১৫
ছত্তিশগড়	—	১০

উপলব্ধ হয়, সেই কারণে পারমিট বা লাইসেন্সও যাতে দ্রুত ও সহজে পাওয়া যায় সেদিকে সরকার কড়া নজর দিয়েছে। এক্ষেত্রে দিল্লি ও মুম্বই অনলাইন অনুমোদন দেওয়া ইতিমধ্যেই চালু করে দিয়েছে। এর ফলে আগে যেখানে প্রকল্প শুরুর ছাড়পত্র পেতে বছর ঘুরে যেত সেখানে ৩০ দিনে হয়ে যাচ্ছে। আরও ৫০টি শহর যেখানে জনসংখ্যা ১০ লক্ষের বেশি তারাও এই প্রক্রিয়ার পাইপ লাইনে রয়েছে।

বিভিন্ন শহরে নতুন ধরনের উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে যে বিপুল উৎসাহে কাজ হচ্ছে তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে কেন্দ্রীয় স্তর থেকে পরিবর্তনীয় শহর সংস্কার (Transformative Urban reforms)-এর ওপর বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ভারতের শহরগুলি এই মুহূর্তে দীর্ঘদিনের উত্তরাধিকার ঝেড়ে ফেলে এক নতুন উৎসাহে পথ চলা শুরু করেছে। তারা শহরের নতুন নক্সা তৈরি করেছে। অসাধারণ প্রকল্প হয়েছে। সমগ্র প্রক্রিয়াটি আর একটু পরিষ্কার হয়ে গেলেই শহরবাসের নতুন অভিজ্ঞতা দেশবাসীর জন্য অপেক্ষা করছে। তাই সরকার কিছু দিনের মধ্যেই ভারতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম City Liveability Index প্রকাশ করবে। ভাবা যায়। ভারতের শহরগুলি কোন দিক থেকে আয়ের ক্ষেত্রে এগিয়ে তা এসে যাবে একেবারে হাতের মুঠোয়।

(লেখক কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রী)

"অবিরাম প্রার্থনা এবং অশ্রুতপূর্ব তপস্যা মিলিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে এমন এক গভীর ভাবের সৃষ্টি হয়েছিল, যাতে অহংবোধের লেশমাত্র অবশিষ্ট ছিল না। রামকৃষ্ণ পরমহংস 'সমগ্রের' (পূর্ণ আদর্শের) এক সারসংক্ষেপ। আমাদের যে (ক্ষুদ্র) জীবনতরঙ্গ অনন্ত আত্মার চৈতন্যপ্রবাহে বিধৃত হয়ে সমুদ্রাভিমুখে ধাববান— তাঁর মতো মহান অতিচেতন সত্তাই কেবল সে তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করতে পারে। আমাদের পশ্চাতে এবং সম্মুখে যে শক্তি পরিব্যাপ্ত রয়েছে, তিনিই তার প্রমাণস্বরূপ।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

চিঠিপত্র

পঞ্চায়েত নির্বাচন

॥ ১ ॥

পশ্চিমবঙ্গে আগামী ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে। এখন থেকেই সমস্ত রাজনৈতিক দল মাঠে নেমে পড়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে 'চোখের মণি' করে লড়াই শুরু হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে এই দাবিও করা হচ্ছে— কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে নির্বাচন করাতে হবে। বিগত কয়েকটি নির্বাচন দেখে মনে হয় না যে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ করলেই সঠিক এবং সুষ্ঠু নির্বাচন হবে। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করেন রাজ্য সরকার ও রাজ্যপুলিশ। যার ফলে ওরা ওদের দায়িত্ব পালনে অক্ষম। রাজ্য পুলিশ যেভাবে ওদের কাজে লাগান ওরা সেই ভাবে কাজ করতে বাধ্য হয়। দূরদর্শনের সৌজন্যে আমরা দেখেছি বাহিনীকে বসিয়ে রাখতে, ইচ্ছা করেই বাহিনীকে কাজে লাগানো হয় না শাসকদলের অঙ্গুলি হেলনে। আমরা আরও দেখেছি ভোটারদের বুথ থেকে বের করে দিতে। এও দেখেছি প্রার্থী স্বয়ং বুথে ঢুকে ভোটারদের বাধ্য করছেন নিজ প্রতীকে ভোট দিতে। দেখেছি বিরোধী দলের পোলিং এজেন্টদের মেরে বুথ থেকে বের করে দিতে। দলবদ্ধ ভাবে বুথে ঢুকে ছাপ্পা ভোট দিতে। নেতারা নিজেরাই গণতন্ত্র মেনে চলে না, তাই নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করা হয়। বিশেষ করে শাসক দল।

তাই আমি কয়েকটি প্রস্তাব রাখছি, যেমন— (১) কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে নির্বাচন করাতে হবে। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নির্বাচন কমিশন নিয়ন্ত্রণ করবে। নির্বাচন কমিশনই বাহিনীকে বুথে পাঠাবে। সেখানে রাজ্য সরকার ও রাজ্য পুলিশের কোনো ভূমিকা থাকবে না। রাজ্য সরকারি কর্মীদের নির্বাচন কাজে নিয়োগ করা যাবে না। (২) বুথে ঢোকার পথে ভোটার কার্ড ও ভোটার স্লিপ দেখে তবেই বুথে ঢুকতে দেওয়া হবে। বিশেষ অনুমতি পত্র ছাড়া কাউকে বুঝে ঢুকতে দেওয়া হবে না। (৩) বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে যাতে কেউ আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বুথে ঢুকতে না পারে। (৪) প্রতি বুঝে অন্তত ১০ জন সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করতে হবে। বুথের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় বাহিনীর হাতেই থাকবে। (৫) বুথ থেকে ৫০০ গজের মধ্যে ভোটার ছাড়া অন্য কাউকে ঢুকতে না দেওয়া। (৬) একটি সর্বদলীয় বুথ কমিটি গঠন, এই কমিটি গঠনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনকেই নিতে হবে। কমিটির কাজ হবে বুথে বুথে ঘুরে দেখা যাতে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হয়। আমার মনে হয় না রাজনৈতিক দলগুলো রাজি হবে।

—**অনিল চন্দ্র দেবশর্মা,**
দেবীবাড়ি, নতুন পাড়া, কোচবিহার।

॥ ২ ॥

গ্রাম পঞ্চায়েত, পৌরসভা নির্বাচনে রাজ্য পুলিশ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকে। কিন্তু এ রাজ্যে ব্যাপক হিংসা, পক্ষপাতিত্ব, বাহুবলে বহু ক্ষেত্রেই জনমত পদদলিত হয়। তাই অন লাইনের মাধ্যমে প্রার্থীপদ জমার ব্যবস্থা হোক। ভোটের সময় প্রত্যেকের আধার কার্ড বাধ্যতামূলক হোক। ব্যাঙ্কের এটিএম-এর মতো কৌশলে ইভিএম-এ আধার কার্ড ছোঁয়ানো হোক। এরপর আঙুলের ছাপে ইভিএম খুলবে এবং ভোটার তার ভোট দেবে। গণনাকেন্দ্রে গণনা চলার সময় সেই বিধানসভা ক্ষেত্রের যে কেউ (অর্থাৎ অন্য বুথের ভোটার হলেও) থাকবে। এই ব্যবস্থা হলে পোলিং এজেন্টদের নিরাপত্তা সুরক্ষিত হবে। এভাবে ভোট হলে নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হবে হবে না একথা বলা যায়।

—**প্রশান্ত কুমার কর,**
বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া।

৩৫৬ ধারা নয়

সম্প্রতি একটি দৈনিকে পড়লাম, পশ্চিমবঙ্গে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে রাষ্ট্রপতি শাসন লাগু করা হোক। অভিনেত্রী ও বর্তমানে বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় নাকি বলেছেন, ভুলেও ওই কাজ করবেন না। তাহলে বর্তমান সরকার সাধারণের সহানুভূতি প্রাপ্ত হয়ে শহিদ হয়ে যাবে। গত ২৪ এপ্রিল সিউড়ী শহর যে জনজাগরণ দর্শন করলাম, তাতে সারা বাংলায় একটি প্রতিছবি দেখা গেল।

সারা বাংলা জুড়ে একই চিত্র, সেটা ৬৯ বর্ষ ৩৩ সংখ্যায় 'স্বস্তিকা' প্রচার করেছে। বাংলার জনসাধারণ টগবগ করে ফুটছে। এই আবেগটা বিজেপিকে ধরে রাখতে হবে। তাহলে অভিষ্ট লাভ হবে। ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে এ সরকারকে ফেলে দেবার দরকার নাই। এরা নিজের কবর নিজেরা তৈরি করেছে।

রোজভ্যালি, ব্যাসিল, সারদা ইত্যাদি বিভিন্ন চিটিং ফান্ডে যেভাবে এরা সাধারণের অর্থ উৎকোচ হিসেবে ফান্ডের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রায় জোর করে আদায় করেছে। সাধারণের অতি কষ্টের সঞ্চিত ধনরাশি বেহাত হয়ে, সকলে আজ পথের ভিখারীতে পরিণত হয়েছে। কেউ কেউ দুঃখে, লজ্জায়, ক্ষোভে আত্মহত্যার পথ গ্রহণ করেছে। এরপর নারদা কাণ্ডের যে চিত্র সাধারণ দেখেছে বা জেনেছে তাতে তাদের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে ৩৪ বছর নাগপাশে আবদ্ধ থেকে এবার অক্টোপাশের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। অতএব এ সরকারকে ৩৫৬ ধারাতে ফেলতে হবে না। কেবল সিবিআই আরও একটু সক্রিয় হয়ে যাদের নামে এফ আই আর হয়েছে, তাদের এবার গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করুক। কানগুলিকে একটু টান দিন, দেখবেন মাথা আপনি আসছে। তাহলে এই সরকার করুণ দশাপ্রাপ্ত হবে। ৩৫৬ ধারার কোনো দরকার নেই।

—**লক্ষ্মণ বিষ্ণু,**
সিউড়ী, বীরভূম।

পশ্চিমবঙ্গের পুনর্নির্মাণ

ভক্তিপ্রসাদ অধিকারী

শুরু হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গের পুনর্নির্মাণ। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে এই নির্মাণকার্যে আপনি থাকবেন কি থাকবেন না, তা একান্তই আপনার সিদ্ধান্ত। দেশ ও সমাজের একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, তা হলো— যা কিছু বিনাশযোগ্য, তা বিনষ্ট হবেই। আর যা কিছু সৃজনাত্মক, তা কিন্তু কালের নিয়মেই সাকার হয়ে উঠবে। এই ২০১৭ সালেই পশ্চিমবঙ্গ নামক অঙ্গরাজ্যটির পুনর্নির্মাণ শুরু হয়েছে, কালের সেই নিয়ম মেনেই।

সাম্প্রতিক সময়ে কোনো এক ইমামের আগুনঝরা প্রকাশ্য ভাষণে অনেকেই দেখছি উষ্মা প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পূর্বাভাসও

দিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত রাজনীতি সম্পর্কে একটু আধটু যাঁরা খবর রাখেন, তাঁরা মানবেন যে, ইমাম সাহেবও কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের এই পুনর্নির্মাণের কাজকেই ত্বরান্বিত করছেন। দেশের প্রকৃত পরিবর্তন ও পুনর্গঠনের সেই জাতীয় কর্মযজ্ঞে সকলেই যে যার মতো করে কাজ করছেন। এই বাস্তব সত্যটিকে স্বীকার করাই ভালো।

একদিন অবিভক্ত বাংলা ভারতের সাংস্কৃতিক জাতীয়তার ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল, নেতৃত্ব দিয়েছিল বাঙালি হিন্দুর মেধা, মনন ও কর্মকুশলতা। আজকের এই যুগসন্ধিক্ষণে, বাঙালি হিন্দুর হারিয়ে যাওয়া শৌর্য, সাহস ও শক্তির পুনর্জাগরণ শুরু হয়ে গেছে। কবির ভাষায় বলা যায়, 'ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান, নীরব হয়ে, নম্র হয়ে, পণ করিও প্রাণ।'

তবে যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন সৈন্যবাহিনীকে সেনাপতির নির্দেশ মেনে চলতে হয় তেমনি সেনাপতিদেরও যথেষ্ট সচেতন থাকতে হয়, সমকালীন পরিস্থিতির সম্বন্ধে। আজকের এই সাংবিধানিক পরিকাঠামোর মধ্যে থেকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে নজর রাখা দরকার যে— পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের এই নবজাগরণ ও স্বদেশ পুনর্নির্মাণের কাজে বাধা আসছে কোথা থেকে। এক কথায় নির্দ্বিধায় বলে ফেলা যায় তা হলো ধর্মনিরপেক্ষতা। আজকের দিনে ধর্মের ত্রিশূলে কন্ডোম পরিয়ে দিচ্ছেন ধর্মনিরপেক্ষ কবি, মার্কসবাদী সাহিত্যিকার সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কলম ধরে কানঢাকা টুপি পরে বসে আছেন বুদ্ধিজীবী সেজে। তাদের আছে নানান মাধ্যম— সিনেমা, থিয়েটার, বাংলা সিরিয়াল, উগ্র বামপন্থার গেরিলাবিপ্লব, তথাকথিত মানবাধিকার রক্ষা কমিটি— আর ভারতবিরোধী শক্তির দালাল মিডিয়া। সমাজে সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও অধঃপতনকে ত্বরান্বিত করছে গণতান্ত্রিক গুণ্ডারাজ। আমরা যারা, নিজেদের সমাজ সচেতন ও রাজনীতি সচেতন বলে মনে করি এবং আমরা যারা ভারতের সাংস্কৃতিক জাতীয়তা রক্ষায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ— তাদের প্রত্যেককেই আরো একবার ফিরে দেখতে হবে আমাদের পিছনদিকের ইতিহাস।

কারণ ২০২২ সালেই ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭৫ বছর পূর্ণ হবে। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের পুনর্নির্মাণের এই সময়ে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত সত্যের পক্ষে দাঁড়ানো, ধর্মের পক্ষে দাঁড়ানো। ধর্মনিরপেক্ষতার বিনাশ আসন্ন, তাকে স্বাভাবিক ভাবে শেষ হতে একটা সুযোগ দেওয়া দরকার। সুতরাং ভারতের পুনর্নির্মাণে ও ধর্মের প্রতিষ্ঠায় যে দল বা গোষ্ঠী কাজ করছে, তাদের শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ■

প্রভু জগন্নাথের জ্বর

উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল

তিনি তখন নীলমাধব। জঙ্গলের মধ্যে এক গাছের তলায় তাঁর অবস্থান। তাঁর পূজারি বিশ্বাবসু। সে জাতিতে শবর। পূজার কী আর উপকরণ। বনের সামান্য ফল, মূল, কন্দ। এই ভাবেই বিশ্বাবসুর দ্বারা দীর্ঘদিন তিনি অর্চিত হয়ে আসছেন। তারপর সেখান থেকে অনেক কাণ্ড করে অবন্তীনগরের সূর্যবংশের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁকে শ্রীক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করলেন। নীলমাধব হলেন জগন্নাথ। সেটা ছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথি। ওইদিন তাঁর আবির্ভাব।

কীভাবে তাঁর অভিষেক হবে তাও তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন। যেমন, তাঁকে স্নান করাতে হবে। স্নানের কূপ নির্দিষ্ট আছে। সিন্ধুকূলে যে অক্ষয়বট আছে, তার উত্তরে আছে একটি সর্বতীর্থময়ী কূপ। এ কূপ তাঁরই নির্মাণ। কিন্তু বর্তমানে তা বালুরাশির দ্বারা আচ্ছাদিত। তা উদ্ধার করে সেই জলেই হবে তাঁর স্নান।

জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় সেই কূপ থেকে জল এনে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র ও দেবী সুভদ্রাকে স্নান করানো হলো। সেই রীতি আজও সমান ভাবে চলে আসছে। প্রথমে স্নান মঞ্চকে খুব ভালভাবে সাজনো হয়। মণিমুক্তা, মালা, পুষ্প, চামর, পতাকা, তোরণ দিয়ে সুন্দর সুজ্জিত হয় স্নান মঞ্চ। অগুরু ধূপ দিয়ে সমগ্র স্থান সুবাসিত করা হয়, প্রথমে মন্দিরের ভিতরে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলভদ্রের অভিষেক অধিবাস হয়। তার পর স্নানের উদ্দেশ্যে তিন দেববিগ্রহ ও সুদর্শনকে মঞ্চে আনা হয়। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের নির্মিত স্নান বেদি কালক্রমে জীর্ণ ও ভগ্ন হয়ে পড়ায় মহারাজ শ্রী অনঙ্গ ভীমদেব বর্তমান স্নানবেদি নির্মাণ করান। মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্যে এই বেদির এমন জায়গায় অবস্থান যে রাস্তা থেকেও হাজার হাজার মানুষ এই পবিত্র স্নান অবলোকন করে কৃতার্থ হতে পারেন। অধিবাস করে তিন বিগ্রহ এবং সেই সঙ্গে সুদর্শনকে স্নানবেদির উদ্দেশে সাড়ম্বরে আনা হয়, একে বলে পহন্তি বিজয়। বিগ্রহ আনতে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। পট্টবাসের দ্বারা সর্বাঙ্গ উত্তমরূপে মুড়ে দেওয়া হয়। চামর, তালপাখা দিয়ে বাতাস করা হয়। ভাবা হয়, দেবতাগণও স্নানযাত্রী, এই স্নানযাত্রার সাক্ষী। তাঁরাও উল্লসিত হন, আর ভাবেন

জগদীশের বোধ হয়, বৈকুণ্ঠে আসার বাসনা হয়েছে, তাই তাঁরা আনন্দে 'হে রাম, হে কৃষ্ণ, তোমাদের জয় হোক' এই ধ্বনি তোলেন। চারদিক জুড়ে তখন প্রভুর 'জয় জয়াকার' হয়।

স্নান বেদিতে দেব-বিগ্রহ ও সুদর্শনের উপবেশনের পর শুরু হয় স্নান করানো। নির্দিষ্ট কূপ থেকে ১০৮ টি স্বর্ণকলসে জল আনা হয়। বছরের অন্য সময় এই কূপ ব্যবহার হয় না এবং ঢাকা থাকে। লোকশ্রুতি এই কূপের মধ্যে মা শীতলা অবস্থান করেন। কেবল স্নানযাত্রার জন্য এই কূপের জল ব্যবহার করা হয়। সুবর্ণ কলসের জলে নানাবিধ সুগন্ধি মিশিয়ে স্নান করানো হয়। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন যখন স্নান করান তখন স্বর্গ থেকে ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণ এসেছিলেন। ব্রহ্মার নেতৃত্বেই স্নানযাত্রা সম্পন্ন হয়েছিল। ভক্তের বিশ্বাস, আজও দেবতারা এই স্নানযাত্রা দর্শন করতে আসেন :

"স্নানকালে দেবগণে আইল সেই স্থানে
স্নান করাইয়া জগন্নাথে।
দেখিতে দেবের লীলা সব দেবে হয়ে মেলা
রহিলা ভারত শূন্য পথে।।"

স্নানের পর জগন্নাথ গণেশরূপ ধারণ করেন, আর এই স্নানের ফলে জগন্নাথের দেহে জ্বর আসে। জ্বরে তেতে ওঠে সর্বাঙ্গ। একেবারে ধুম দিয়ে জ্বর। আর এক বেলা বা দুই বেলা, একদিন কী দুদিন নয়, টানা এক পক্ষকাল ধরে থাকে এই জ্বর।

জ্বরযুক্ত শরীরে জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলভদ্র এবং সুদর্শনকে মূল মন্দিরের গর্ভগৃহে রত্নবেদিতে আনা হয় না। তখন নিয়ে যাওয়া হয় সেবা শুশ্রূষার জন্য অনবসর পিণ্ডিতে। একে নিরোধন বা আতুরগৃহও বলে। গর্ভগৃহের কাছেই এই নিরোধনগৃহ। এই সময় সাধারণের দর্শন নিষিদ্ধ। কেবল সেবকরা থাকেন চিকিৎসার জন্য। চিকিৎসা চলে বৈদিক মতে।

"শ্রীরাম সুভদ্রাসনে করি কৃষ্ণে নিরাসনে
করাইল প্রবেশ আলয়ে।

সেই কালে কদাচিতে না দেখিবে জগন্নাথে
সত্য সত্য করিনু সবারে।"

জগন্নাথ মানেই বিশাল। তাঁর কোনো কিছু ক্ষুদ্র নয়। বিশাল তাঁর মন্দির। তাঁর 'পীনাঙ্গ' অর্থাৎ বিশাল বপু, বিশাল বাহু, বিশাল লোচন, ছাপান্ন রকম ভোগ। তাঁর জ্বরও সামান্য নয়, আর এই জ্বরের চিকিৎসার আয়োজনও এক বৃহৎ কর্মযজ্ঞ। সেবক বা দয়িতাগণ দিনরাত চিকিৎসা করে প্রভুকে সুস্থ করে তুলতে চান।

অনবসর গৃহে বংশাবৃত স্থানে 'চতুর্ধা মূর্তি' অর্থাৎ জগন্নাথ বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শনকে রাখা হয়। তাঁরা থাকেন একটি সুসজ্জিত, মনোরম পালঙ্কে। একটি মোটা কাপড়ে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম ও দেবী সুভদ্রার মূর্তি চিত্রিত করা হয়। শ্রীকৃষ্ণমূর্তি মেঘের মতো ঘননীল, ঘনশ্যাম, চতুর্ভুজ, হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম, গলে বনমালা, বক্ষে কৌস্তুভ। শ্রীবলরামের শ্বেতবর্ণ, চতুর্ভুজ, শঙ্খ, চক্র, হল ও মুষলধারী তিনি। সুভদ্রা মূর্তিও চতুর্ভুজ, তাঁর হলুদ বর্ণ, হাতে পদ্ম এবং বর ও অভয়সূচক মুদ্রা।

তিনখানি পটে তিন মূর্তি চিত্রিত করে পূর্বদ্বার থেকে শুরু করে মন্দির প্রদক্ষিণ করা হয়। এরপর পূর্বে স্থাপিত মনোরম পর্য্যাঙ্কে শ্রীবলভদ্রের সম্মুখে শ্রীরাম, নৃসিংহ ও শ্রীকৃষ্ণের চিত্রিত মূর্তি, সুভদ্রার সম্মুখে বিশ্বধাত্রী ও লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি এবং জগন্নাথের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের চিত্রিত মূর্তি স্থাপন করা হয়। এরপর দর্পণের প্রতিবিম্বে পঞ্চামৃত দ্বারা মহাস্নান শেষে যথাবিধি পূজা হয়। এইদিন থেকে পূজার্চনার সঙ্গে সঙ্গে পুরোদস্তুর চিকিৎসাও চলে। এই পুরো কাজটাই করেন মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের পুরোহিত বিদ্যাপতি এবং নীলমাধবের সেবক বিশ্বাবসুর বংশধরগণ।

রাধাভাবে শ্রীজগন্নাথের পূজা হয়, ভাবা হয় অষ্টসখী নিরোধনগৃহে অবস্থান করছেন। অসুস্থ বলে যেমন অন্ন দেওয়া হয় না, তেমনি রাধাভাবে পূজার্চনা হয়, তাই উপচারে তুলসীপত্রও থাকে না। পথ্য হিসেবে দেওয়া হয় বিভিন্ন ফল, দুধের মিষ্টি, ভেজানো মুগডাল প্রভৃতি। ওষুধ হিসেবে সেবন করানো হয় পাঁচন। ১০৮ স্বর্ণকলসের জলে মহাস্নানের ফলে দেববিগ্রহের স্বাভাবিক বর্ণ বিকৃত হয়, তাই একই সঙ্গে চলে স্বাভাবিক রূপদানের কাজ। ছ'দিন ধরে চলে দারুমূর্তিতে লেপনাদি কাজ। সপ্তমদিনে সুগন্ধী তিল তেল দিয়ে মর্দন করা হয়। অষ্টমদিনে পট্টবস্ত্রের সূত্র দ্বারা দারুমূর্তির সর্বাঙ্গ জড়িয়ে সর্জ বৃক্ষের রস সুবাসিত তেলে মিশিয়ে সর্বাঙ্গে মালিশ করা হয়। নবম দিনে চিকন আর্দ্র বস্ত্রের সাহায্যে পূর্বের লেপন মুছে ফেলা হয়। দশম দিবসে অতি চিকন বস্ত্র দ্বারা দারুপ্রতিমা আচ্ছাদন করে রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কস্তুরী, কুমকুম প্রভৃতি দ্বারা আরেকবার লেপন করা হয়। এই অঙ্গবিলোপনের কাজ খুব সতর্ক ও নিঃশব্দে করতে হয়, এতটাই নিঃশব্দে, যাতে লেপনকারীর কর্ণগোচর না হয়, অন্যথায় বধির হয়ে যেতে পারে চিরদিনের জন্য।

এরপর শ্রীবিগ্রহের নেত্র চিহ্নিত হয়, অঙ্গরাগ সম্পূর্ণ হয়। প্রভু যেন নবযৌবন লাভ করেন; সুস্থ হয়ে ওঠেন। দীর্ঘ জ্বর ভোগের পর ভক্তদের দর্শন দিতে আবার অগ্রজ ও ভগিনীকে সঙ্গে নিয়ে রত্নবেদিতে আরোহণ করেন।

এখন প্রশ্ন জাগে, ত্রিভুবনের ঈশ্বর পুরুষোত্তম জগন্নাথের দিব্য, অপ্রাকৃত শরীরে কেন এই জ্বর, কেন এই মানুষী দুর্বলতা? নিখিল জগতের উদ্দেশে এ কি এক বার্তা? শরীর ধারণ করলেই রোগ ব্যাধির শিকার হতে হবে। স্বয়ং ভগবানও এই নিয়মের বাইরে নন? সীতা হরণ করেছে রাবণ, শ্রীরামচন্দ্র বিলাপ করছেন, 'সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী'। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, মা, আমি আর মাখন খাব না। দেহত্যাগ করছেন এক ব্যাধের বাণে। আর পুরুষোত্তম জগন্নাথ স্নান করার পর ঠাণ্ডা লেগে জ্বরে বেহুশ হয়ে পড়ছেন। পাঁচন খাচ্ছেন। ভক্ত-ভাবুক, মহাজনগণ অন্য কথাও বলেন।

শ্রীমতী রাধারানিকে কলঙ্কমুক্ত করার জন্য একদিন গোবিন্দ বাড়ি এসে জ্বরে অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। মা যশোদা গোপালের গায়ে হাত দিয়ে আঁতকে ওঠেন— এ কি! গোপালের গা যে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। নন্দবাবা বৈদ্যদের ডাকলেন, কিন্তু কিছু হলো না। তখন গোবিন্দই আবার বৃদ্ধ বৈদ্য সেজে এসে নিদান দিলেন— বৃন্দাবনের এক সতীসাধ্বী রমণী যদি শতছিদ্রযুক্ত কলসীতে যমুনা থেকে জল এনে শ্রীকৃষ্ণকে স্নান করায় তাহলে এই জ্বর ছাড়বে।

কিন্তু কে যাবে? কারোর সাহস হয় না। রাধার ননদিনী কুটিলা গর্ব করে জল আনতে গেল। পাড়ে উঠতেই আছাড় খেল। জল গড়িয়ে পড়ল। সবাই হেসে উঠল। কুটিলা অপ্রস্তুত। সতীত্বের গর্ব চূর্ণ। তখন রাধারানি অগ্রসর হলেন। তিনি অনায়াসে যমুনা থেকে শতছিদ্রযুক্ত কলসে জল এনে শ্রীকৃষ্ণকে স্নান করালেন। গোবিন্দ উঠে বসলেন, তিনি সুস্থ, জ্বরমুক্ত, তাঁর মুখে সেই ভুবনভোলানো হাসি। ব্রজবাসীরা নির্বাক। তাঁরা রাধারানির গুণগান গাইতে লাগলেন। তাঁরা এতদিন রাধারানিকে 'কলঙ্কিনী' বলে কত কটূক্তি করেছেন। বলেছেন কৃষ্ণকলঙ্কিনী। কিন্তু দ্যাখো, এই ব্রজধামে রাই আমাদের সতীসাধ্বী রমণী। তিনিই তো পারলেন ছিদ্রময় কলসে জল আনতে, আর সেই জলে গোবিন্দ সুস্থ হলেন। রাধারানির নামে সবাই জয়ধ্বনি করলেন।

ভগবৎতত্ত্ব অনুসারে রাধারানির বিগলিত প্রেমই এই স্বর্ণকূপে জল হয়ে জমে আছে। এই প্রেমরূপ জলে স্নান করে কৃষ্ণরূপী জগন্নাথদেবের মনে পড়ে যায়— সেই গোঠ গোকুলে রাধারানির সঙ্গে অমৃতলীলা, মনে পড়ে কলঙ্ক ভঞ্জনের সুখস্মৃতি, তাই জগন্নাথদেবের বরতনুতে রাধাপ্রেম রূপ বারিস্নানে ধেয়ে আসে প্রবল জ্বর। লীলাময় পুরুষোত্তম জগন্নাথের এ এক অপূর্ব অমৃত নরলীলা।

(জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে প্রকাশিত)

ভারত সেবাশ্রম
সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

মহাভারতের নারী
বিদুর পত্নী দেবিকা

দেবপ্রসাদ মজুমদার

মহাভারতের বিদুর চরিত্র মহাভারতকার কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের এক অভিনব সৃষ্টি বলা যায়, সমগ্র মহাভারতে বিদুর প্রতিবাদী এবং ন্যায়নিষ্ঠ। তাঁর অসামান্য ত্যাগ, তিতিক্ষা, ধর্মজ্ঞান এবং সংযম তাঁকে আরও মহিমান্বিত করে তুলেছে। এই বিদুরের পত্নী ছিলেন দেবিকা। লোককথায়, কাহিনি, কিংবদন্তীতে এই মহিয়সী নারীর বহু কথা শোনা যায়। অথচ তাঁর নামটাই অনেকের কাছে স্পষ্ট নয়। এর কারণ, বিদুরের মহান চরিত্র ও তার পাদপ্রদীপের তলায় অন্ধকারের মতো দেবিকা চরিত্র।

মহাভারতকার ওই চরিত্র সৃষ্টি করে তাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করেছেন। মহাভারত পাঠে জানা যায় বিদুর কুরুরাজ্যের মহামন্ত্রী ও ধৃতরাষ্ট্রের উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা ছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই রাজকার্যাদিতে ব্যস্ত থাকতেন, তাঁর পরিবারের কাজকর্ম নিশ্চয়ই পত্নী দেবিকার তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে পরিচালিত হোত। মহাভারত পাঠে জানা যায় পরিবারের সদস্য পরিজন ব্যতিরেকে রাজমাতা কুন্তী বহুদিন বিদুর আলয়ে ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণাদি অন্যান্য মহান পুরুষেরা একাধিক সময়ে তাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা যে সকলেই সম্মানের সঙ্গে আপ্যায়িত ও যথোপযুক্ত তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি লাভ করেছিলেন তা বলাই বাহুল্য। এই বিষয়ে বিদুর পত্নী দেবিকা অবশ্যই কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। অথচ মহাভারতকার এই মহিয়সী নারী ও তাঁর পুত্রদের সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলী করে রেখেছেন, কিন্তু চরিতার্থ করবার কোনো উপায় রাখেননি।

এখন ওই দেবিকার পরিচয়ে আসা যাক। মহাভারতে জাতিভেদ প্রথা ছিল। সমাজ ধর্ম ও ন্যায় নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোত। আমরা সকলেই জানি মহামতি বিদুরের জন্ম হয়েছিল মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের ঔরসে রানি অম্বিকার এক দাসীর গর্ভে। তৎকালে মহাভারতের যুগে এমন ক্ষেত্রজ পুত্র গ্রহণ কোনো দোষের ছিল না। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর মতো বিদুরও বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রজ পুত্ররূপে সমাজে পরিচিত ছিলেন। শূদ্রা (দাসী) জননীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মেছিলেন বলে তৎকালের সামাজিক নিয়ম অনুসারে তিনি রাজ্যের অধিকারী ও দাবিদার হতে পারেননি। শূদ্রা জননীর গর্ভে ব্রাহ্মণ জনকের ঔরসে জাত ব্যক্তিকে পারসব বলা হোত। বিদুর পারসব ছিলেন। পারসব অর্থেই মহাভারতে 'ক্ষত্তা' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। আভিধানিক অর্থে ক্ষত্তা বলতে শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার বা ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত সন্তানকে বোঝায়।

ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর বিবাহের পর ভীষ্ম বিদুরের বিবাহের জন্য তৎপর হলেন। বিদুরের বিবাহের জন্য 'পারসবী' কন্যার প্রয়োজন ছিল। ভীষ্ম অনুসন্ধান করে জেনেছিলেন যে মহামতি দেবকের এক পারসবী সুন্দরী কন্যা আছে। ব্রাহ্মণের দ্বারা শূদ্রার গর্ভজাতা কন্যাকে পারসবী বলা হয়। ওই কন্যাটি রূপবতী, সুশীলা এবং বিবাহের উপযুক্তা। কন্যাটির নাম দেবিকা। লক্ষ্যণীয় মহামতি দেবক তৎকালে কোথাকার রাজা ছিলেন সে সম্বন্ধে মহাভারতকার কিছুই বলেননি। যাইহোক মহামতি ভীষ্ম কন্যা দেবিকার পালক পিতা দেবকের কাছে উপস্থিত হয়ে বিদুরের পত্নীরূপে বরণ করবার জন্য তাঁর কন্যাটিকে প্রার্থনা করলেন। সেই সঙ্গে তিনি বিদুরের জন্মপরিচয় ও বিদুর যে জাতিতে পারসব তাও নিবেদন করলেন। ভীষ্মের প্রস্তাব শুনে কন্যার পিতা দেবক সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। তৎকালের রীতি অনুযায়ী মহাবীর ভীষ্ম দেবিকাকে রথে সসম্মানে নিয়ে হস্তিনাপুরে আনলেন ও রাজকীয় ভাবে বিদুরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিলেন। পরবর্তীকালে বিদুরের ঔরসে ও দেবিকার গর্ভে কয়েকজন সৎপুত্রের জন্ম হয়েছিল।

ওই সকল পুত্রগণ বিদুরের মতো গুণবান ছিলেন। এখানেই মহাভারতকার দেবিকা ও তাঁর পুত্রদের কাহিনি শেষ করেছেন। কারণ দেবিকা বা তাঁর সৎপুত্রদের আর কোনো কাহিনি মহাভারতকার ব্যক্ত করেননি। কেন করেননি তা মহাপ্রাজ্ঞ বেদব্যাসই বলতে পারেন, হয়তো তাঁদের আর কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমাদের জিজ্ঞাসা থেকেই গেল। তবে দেবিকা ও তাঁর পুত্রগণ যে মহান ছিলেন, এবং সাংসারিক জীবনে বিদুর সুখী ছিলেন। তা তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণেই বোঝা যায়। ■

অঙ্গনা

স্কুল দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত করার দাবি
হরিয়ানায় মেয়েদের অনশন

সুতপা বসাক ভড়

আমাদের দেশে মেয়েদের অবস্থা কতটা করুণ তা আন্দাজ করা যায়, স্বাধীনতার ৭০ বছর পরে যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের জনগণের কাছে বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও-এর আবেদন জানান, মেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ে শৌচাগার বানানো বাধ্যতামূলক করেন। প্রকৃতপক্ষে নারী ক্ষমতায়ণের পথে চলা শুরু হলেও সেপথ অনেক দীর্ঘ, সেখানে পদে পদে বাধা। সেই বাধা অতিক্রম করার সাহস মেয়েরা পাচ্ছে। কারণ তারা জানে যে, তাদের এই শুভ প্রদক্ষেপের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পাবে।

হরিয়ানা রাজ্যের রিওয়ারি জেলার গোথরা টাপ্পা দাহিলা এমনই একটি গ্রাম। এখানকার

দাবি মেনে নেওয়ায় উল্লসিত ছাত্রীরা।

বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ১০ মে থেকে অনশন শুরু করেছিল। তাদের দাবি ছিল তাদের গ্রামের বিদ্যালয় দশম শ্রেণী থেকে বাড়িয়ে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত করা হোক। ছাত্রীদের বক্তব্য, তাদের এই দাবি বহুদিনের। তারা একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ার জন্য পাশের গ্রামের বিদ্যালয়ে যায়। তখন তাদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পথে কিছু ছেলে তাদের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করে। বর্তমানে ৮৩ জন ছাত্রী পাশের কানওয়ালি গ্রামে পড়তে যায়। যখন কেউই তাদের আবেদনে গুরুত্ব দেয়নি, তখন তারা ১০ জুন থেকে অনশন শুরু করে। অনশন শুরু হলে অনেক ধনী ব্যক্তি তাদের আশ্বস্ত করেন। কিন্তু নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত তারা অনশন চালিয়ে যাবার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল।

১৩ জন ছাত্রী ১০ মে থেকে অনুশন শুরু করে। বাকি ছাত্রী, তাদের অভিভাবক এবং বেশকিছু গ্রামীণ ব্যক্তি তাদের পাশে ছিল। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান সুরেশ চৌহ্বানের কথা, একদিকে তাদের বিদ্যালয়ে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়বার জন্য যথেষ্ট জায়গা রয়েছে। অপরদিকে ২১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার জায়গায় মাত্র ১৩ জন শিক্ষাদান করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রী সুজাতা বলে যে, রিওয়ারি জেলার ডি এ ও (বিশিষ্ট এডুকেশন অফিসার) ধরমবীর এলডোরিয়ার বক্তব্য হিসেবে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যার্থীদের সংখ্যা ১৫০ হলে, তবেই সেই বিদ্যালয়কে দশম শ্রেণী থেকে বাড়িয়ে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত করা হবে।

অন্যদিকে ছাত্রীরা তাদের দাবিতে অনড় ছিল। তারা অনশন অব্যাহত রাখে। শুধুমাত্র জল খেয়ে থাকার জন্য অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে তারা আবার যথাস্থানে এসে অনশনে বসেছে। তাদের বক্তব্য, তারা কেবলমাত্র শিক্ষার অধিকার চাইছে। বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও-এর স্লোগান দিয়ে তারা তাদের শিক্ষার অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে এবং অবশেষে জয়ী হয়েছে। কর্তৃপক্ষ তাদের দাবি মেনে নিয়েছে। এবার তারা তাদের গ্রামেই সসম্মানে পড়াশুনা করতে পারবে।

এবার রিওয়ারির মেয়েদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে গুরুগ্রামের রাদারপুর গ্রামের দু'শোর বেশি ছাত্রী তাদের গ্রামের বিদ্যালয়ে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার জন্য আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলন শুরু হয় সকাল ন'টা নাগাদ এবং বেশ কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত চলে। বিদ্যার্থীরা তাদের গ্রামের বিদ্যালয়ের রাস্তা বন্ধ করে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে তাদের আন্দোলন আরম্ভ করে।

বিদ্যার্থীদের বক্তব্য, তারা তাদের পাশের গ্রাম সনাক্তপুরের সরকারি বিদ্যালয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছিল, প্রায় দু'কিলোমিটার হাঁটার পর মেয়েদের অটো করে রোজ যাওয়াআসা করতে হয়। এখন উচ্চমাধ্যমিক স্তরে প্রায় ১৫০ জন ছাত্রী কান্দারপুরে পড়ে, যারা বাদশাহপুরের বিদ্যালয়ে যেতে চায় না। পথে কিছু ছেলে অসভ্যতা করে। অনেক সময় যানবাহন ঠিকমতো না পেলে দেরি হয়ে যায় এবং বাদশাহপুরের বিদ্যালয়ে শাস্তি পেতে হয়। শেষ পর্যন্ত আলোচনার মাধ্যমে তাদের দাবি মেনে নেওয়া হয় এবং কান্দারপুরের বিদ্যালয় দ্বাদশশ্রেণী পর্যন্ত উন্নিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

উপরোক্ত ঘটনা দুটি এইজন্য উল্লেখযোগ্য কারণ মেয়েরা পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার সাহস পেয়েছে এবং উচ্চ পদস্থ শিক্ষাধিকারীরাও তাদের এই ন্যায্য দাবি মেনে নিয়ে তাদের শিক্ষার পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছে। ফলে দেশ এখন বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও-য়ের পথে চলেছে। ■

দ্রিঘাংচুর ভূয়োদর্শন
হলদে সবুজ ওরাং ওটাং

ভস্মসার থেকে মিশরীয় ফিনিক্স পক্ষীর পুনর্জন্ম বিশ্ববিদিত। কিন্তু আমাদের দেশে একান্ত নিজস্ব বায়সবংশীয় দ্রিঘাংচুও যে নব নব অবতারে উদিত হয় সেকথায় কেউ কান দেয় না। প্রবাদ অনুযায়ী গেঁয়ো যোগী যেমন ভিখ পায় না, তেমনিই গেঁয়ো পাখিও পাত্তা পায় না। নাহলে সুকুমার রায়ের 'পুরাণ কথায়' দ্রিঘাংচুর কথা পষ্ট লেখা আছে; পেত্যয় না হলে যে কেউ কেতাব খুলে মিলিয়ে নিতে পারেন। তবে খেয়াল থাকে যেন, দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম দাঁড়কাক হলেই তাকে দ্রিঘাংচু বলে ভুল করলে চলবে না। ঝোড়ো কাকের সঙ্গেও তার কোনো মিল নেই। সাধারণত কাক ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই কাংস্যনিন্দিত কা-কা রবে মনোরম প্রভাত স্বপ্নটি মাটি করতে পারে। কিংবা কাকেশ্বর কুচকুচে শেলেট পেনসিল নিয়ে হিসেবে পোক্ত হতে পারে। কিন্তু দ্রিঘাংচু ভুলেও ওসব হেঁজপেঁজি কাজ করবে না।

কারণ দ্রিঘাংচুর মহিমা যথার্থ ভাবেই রাজকীয়। তাই সে একমাত্র রাজসভায় উদয় হয়ে উঁচু থামের ওপর বসে ঘাড় নিচু করে বাঁকা চোখে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলে 'কঃ কঃ।' সেই বিদঘুটে আওয়াজ শুনে ঝিমন্ত রাজার তো পিলে চমকে যাওয়ার অবস্থা। কোথায় সা-রে-গা-মা-পা সপ্তসুরে ভাঁজা মোহন রবে প্রাণ জুড়িয়ে যাবে তা নয়, বিটকেল 'কঃ কঃ' রব শুনে রাজার মেজাজ গেল খিঁচড়ে। রেগে আগুন তেলেবেগুন হয়ে রাজা হাঁক দিলেন, 'জল্লাদ শির লাও'। জল্লাদ বেচারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বিগলিত সুরে বলল, 'মহারাজ কার শির'?

শুনে রাজার মেজাজ উঠল সপ্তমে। ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, 'বেটা গোমুখ্যু কোথাকার! কার আবার, যে ওইরকম বিটকেল শব্দে কান ঝাঁঝাঁ করে দিল তার'। এই গোমুখ্যু জল্লাদরা এমন মাথামোটা যে, এটুকু বোঝে না, রাজার কানের কাছে বিটকেল শব্দ করে যারা শান্তিভঙ্গ করে তাদের গর্দান নিলে তবে শান্তি। ন্যায়ের এই বিধান পুরাকালে যেমন ছিল এখনও তেমনভাবেই আছে। তাই বিদঘুটে সুরে বেখাপ্পা আওয়াজে, সেকালের দেবপ্রিয় রাজা আর বর্তমানের লোকপ্রিয় গণতান্ত্রিক রাজার সুখাবেশে বিঘ্ন ঘটালেই বিপদ। সুতরাং শান্তিভঙ্গকারীকে ধরে জীবনের মতো শিক্ষা দেওয়াই বিধেয়।

কিন্তু 'কঃ কঃ' শব্দ করা সেই বায়সসুন্দরকে ধরবে কী করে। সে তো তখন হাওয়া। তবে রাজার হুকুম নড়চড় হওয়ার নয়। তাকে শনাক্ত করে শিরশ্ছেদ না করলে সকলের গর্দান যাওয়ার উপক্রম। অতএব ডাক পণ্ডিতদের। রঙ্গরত্ন, রঙ্গবিভীষণ, রঙ্গভীষণ, রঙ্গছিরিদের; তারা অবিলম্বে বার করুক এই অ্যাবসকনডিং দীর্ঘচঞ্চুর রহস্য। কিন্তু কী আশ্চর্য উনিশ পিপে নস্য উড়িয়ে, মাথার চুল ছিঁড়েও এই পণ্ডিতরা কেউ রহস্যের কিনারা করতে পারল না।

পারবে কোত্থেকে! কেননা মুশকিল হলো, এই বিদ্যাদিগগজরা রাজসভায় পণ্ডিতি পাওয়ার পর থেকে রাজার পাদবন্দনার পালাগানে এমন বিভোর যে, অন্য কোনোদিকেই তাদের মাথা খোলে না। তাই তারা বিশিষ্ট রাজ-বুজরুকে পরিণত। এমনকী চাকরি হারানোর ভয়ে কেউ মাথা নাড়াতেও সাহস পায় না, পাছে ভুল দিকে মাথা নাড়ানোর ফলে রাজার কোপে পড়তে হয়।

এমনই যখন অচলাবস্থা, এবং রাজরোষের ভয়ে বিহ্বল সকলে, পণ্ডিতদের মূর্খ, অপদার্থ, নিকম্মা বলে একটি তদন্ত কমিশন গঠনের প্রস্তাব দিতে উদ্যত, তখনই কোথা থেকে রোগা শুঁটকো একটা লোক হঠাৎ হাজির হয়ে ইউরেকা ইউরেকা শব্দ করে সভার মাঝখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। অনেক কসরতের পর তার জ্ঞান ফিরতে সে কাকচরিত্র বিচার করে তার নয়া থিসিসটি পড়তে শুরু করল। লক্ষণ মিলিয়ে সকলের মনে হলো, এটি নিশ্চয়ই মহাধনুর্ধর বঙ্গীয় বাম ইনটেলেকচুয়াল বংশাবতংস না হয়ে যায় না। কেননা তেনাদের কাছেই দ্বন্দ্বমূলক ও ধান্দামূলক বাস্তববাদ ধরা পড়ে। পণ্ডিতপ্রবরের ব্যাখ্যাতেই সবশেষে ধরা পড়ল, সভায় যে কঃ কঃ শব্দ করার বেয়াদপি প্রকাশ করে পালিয়েছে সে আসলে দ্রিঘাংচু। সেটা আবার কী, সকলের প্রশ্নের মুখে পণ্ডিতজী বললেন, দেখতে দাঁড়কাকের মতো হলেও, আসলে রাজসভায় এসে যে সাহসী চোখ পাকিয়ে কঃ কঃ বলে, সে নির্ঘাৎ দ্রিঘাংচু না হয়ে যায় না। তাকে ধরার একটি কূটমন্ত্র আছে এবং যে সেই মন্ত্রটি গণেশের মতো বুঝে আওড়াতে পারে, তার পক্ষে দ্রিঘাংচুর আবির্ভাব ঘটানো অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপার।

মহামন্ত্রটি হলো, 'হলদে সবুজ ওরাং ওটাং, ইট পাটকেল চিৎপটাং।' ব্রাহ্মীলিপির মতো এই বায়সচর্যাপদটির অর্থোদ্ধার করা যায়নি বলে দ্রিঘাংচু রহস্যের তল এতদিন পাওয়া যায়নি। কিন্তু দেশের স্বঘোষিত সাংস্কৃতিক রাজধানী শহরে কাব্য অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সে বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে সবুজ দ্বীপের দুই বিশিষ্ট কবিরাজ— একজন গোঘ্ন কবি ও অন্যজন কমডম কবি— পুরাকালের তর্কচঞ্চুদের মতো দ্রিঘাংচু মন্ত্রের রহস্য ফাঁস করে দিয়েছেন। তাঁদের এই অতুল কীর্তির জন্য তাঁরা যখন কবিরত্ন উপাধি গ্রহণের অপেক্ষায় তখন আবার কোর্টকাচারির ঝামেলা এসে উপস্থিত।

কমডম কবি, তাঁর কবিতা কল্পনালতার প্রসাদে মহাদেবের ত্রিশূলের কমডম পরানোর মহৎ প্রচেষ্টা প্রকাশ করায়, মহাদেবের কিছু নন্দীভৃঙ্গী তেড়ে এসে তাঁর কলমের মাথায় কমডম পরানোর আবেদন করে কেস ঠুকে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি হলদে সবুজ ওরাং ওটাং মন্ত্রটির প্রভাবে সে বিপদ সামলে উঠেছেন। আর গোঘ্ন কবি প্রকাশ্যে গোমাংস ভক্ষণ করে সেকুলারিজম প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হয়েছেন। কিছু বেয়াদপ সেকুলার আবার তাতে বাদ সেধে বলেছেন, ওই সঙ্গে সেকুলারভাবে জিন্নাসাহেবের প্রিয় কিঞ্চিৎ বরাহসসেজ ভক্ষণ করলে আরও উত্তম হতে পারত। কিন্তু এই বেয়াদপরা বোধহয় বিস্মৃত যে কাক কাকের মাংস খায় না।

তবে মুক্তচিন্তার প্রবক্তা বঙ্গীয় কবিকুল সকলে কমডম ব্যবহারের স্বাধীনতা, ও গব্যমাংস ভক্ষণের অধিকার রক্ষায় একটি বিবৃতিতে কবির স্বাধীনতা অব্যাহত রাখার প্রয়াসে অধীর হয়েছেন। সবশেষে এনাদের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে সেটি বড়ই আহ্লাদের কথা। কিন্তু কবি তসলিমা নাসরিনের কণ্ঠরুদ্ধ করার জন্য এই গোঘ্ন কবি, বুদ্ধদেবের ভাড়া খাটতে যখন ক্ষিপ্ত ষণ্ডের মতো সগর্জনে চারিদিক মুখর করে তুলেছিলেন, তখন এই কবিকুলভ্রষ্টদের মহান টিকিটিও দেখা যায়নি।

ফঃ ৫

তবে তাই বলে নবপ্রতিষ্ঠিত কাব্য আকাদেমির মহান কৃতিত্বকে মোটেই অস্বীকার করা যায় না। তাঁরা দ্রিঘাংচু কূটমন্ত্রটির রহস্য ফাঁস করে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছেন। তাঁদের ব্যবস্থায়— হলদে সবুজ হলো একটি দ্বন্দ্ব সমাস অর্থাৎ সবুজ ও হরিদ্রাবর্ণ শুশুক বা পুরাতন সবুজী ওরাং ওটাং। অর্থাৎ ওরাং হলো উর্দিধারী সবুজ সেপাই ও ওটাং হলো বে-উর্দি সান্ত্রি। ওরা যখন শান্তিরক্ষার্থে ঢিলপাটকেল ছুঁড়তে আরম্ভ করে তখন সকলেরই চিৎপটাং অবস্থা। মন্ত্রটির প্রাঞ্জল মর্মোদ্ধারে দ্রিঘাংচু আর লুকিয়ে থাকতে পারেনি। অয়ম অয়ম ভোঃ বলে আবির্ভূত হয়েছে। ফলে বহু যুগের ওপার হতে নবকলেবরে দ্রিঘাংচু হাজির হয়ে তার স্বভাবসিদ্ধ 'কঃ কঃ' রবে তার ভূয়োদর্শন প্রকাশে মুখর হয়ে উঠেছে। এখন তাকে ঠেকায় কার সাধ্য। ■

বিশেষ প্রতিবেদন

ঋণমকুবের আশায় কৃষকদের জেনেশুনে ঋণখেলাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ঋণমকুবের আকাশচুম্বী প্রত্যাশাই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কৃষকদের স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে ঋণখেলাপের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এর ফলে আগে থেকেই অনাদায়ী ঋণে জেরবার ব্যাঙ্কগুলি অতিরিক্ত চাপে পড়ে গেছে। সর্বভারতীয় এবং রাজ্যস্তরের ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে ঋণ নিয়ে শোধ না করার প্রবণতা কৃষকদের মধ্যে ক্রমশ বাড়ছে। সম্প্রতি অর্থমন্ত্রকের একটি বৈঠকেও তোলা হয়েছিল প্রসঙ্গটি। ঋণমকুবের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ রাজ্য সরকার পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রক। জানা গেছে, এখনও পর্যন্ত দশ লক্ষ কোটি টাকা কৃষিঋণ হিসেবে ধার্য করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু স্রেফ গত কয়েক মাসেই ঋণখেলাপি কৃষকের সংখ্যা ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এরকম কেন হচ্ছে? নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সর্বভারতীয় ব্যাঙ্কের এক কর্তা বলেন, 'পাছে আমরা কিস্তি কেটে নিই তাই কৃষকেরা তাদের অ্যাকাউন্টে কিছুই রাখছেন না।' দক্ষিণ ভারতের প্রধান একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের ম্যানেজারও কথাটা মানলেন। কোথাও কোথাও আবার কৃষকেরা দল বেঁধে ব্যাঙ্কে চড়াও হয়ে ঋণমকুবের দাবি তুলছেন, এমন ঘটনাও বেনজির নয়। যেন ঋণ করে শোধ না করাটা তাদের হকের পাওনা। মুম্বইকেন্দ্রিক একটি ব্যাঙ্কের সিইও বলেন, 'আমার ঋণ অন্য কেউ শোধ করে দেবেন, এরকম আশা যদি থাকে তাহলে আমি যে আর টাকা ফেরত দেবার ঝক্কি পোয়াব না, সেটা স্বাভাবিক। রাজ্যে-রাজ্যে এখন সেটাই হচ্ছে।' অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, উত্তরপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র কৃষিঋণ মকুবের কথা ঘোষণা করেছে। উত্তরপ্রদেশে যদিও এই ঘোষণা ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মহারাষ্ট্র সরকার বিশদে এখনও কিছু জানায়নি। আশা করা যায় তারাও ঋণমকুবের সুবিধা থেকে সম্পন্ন চাষিদের বাদ দেবে। যে সব রাজ্যে নির্বাচন আসন্ন তারা আপাতত প্রবল চাপে।

অন্তত দুটি সর্বভারতীয় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা ক্রমশ দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২০১৪ সালের নির্বাচনে জিতে আসার পর মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর আমলেই এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪০.০০০ কোটি টাকা ঋণমকুব করা হয়েছে। ■

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

রাগ থেকে রোগ

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে লুকিয়ে থাকে অন্য একটা আমি। তার দ্বিতীয় সত্তা। যা কখনও খুব চেনা, কখনও বা অচেনা। চেনা অনুভূতিগুলো যখন সহজ, সরল ও স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় তখন সামনের চেনা মানুষটা চেনাই থাকে। কিন্তু অনুভূতি যখন রুক্ষ হয়ে যায়, তিক্ত হয়ে যায়, তখন চেনা মানুষটা হয়ে যায় অচেনা। তাঁকে অন্যরকম মনে হয়। আমাদের মনের অনুভূতিগুলোর অন্যতম হলো রাগ। মনের গোপন হতাশা তিক্ততার বহিঃপ্রকাশ ঘটে রাগের মাধ্যমে।

রাগ আসলে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ। কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেই থাকে। কিন্তু সেই প্রকাশ যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তখন কিন্তু রাগ অস্বাভাবিক রূপ নেয়।

রাগের কতটা প্রকাশ স্বাভাবিক তা পুরোটাই আপেক্ষিক বিষয়। একজন মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্রবৈশিষ্ট্যের ওপর অনেকটা নির্ভর করে। সেই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কেউ কম রাগী, কেউ আবার বেশি। এর পাশাপাশি রাগের প্রকাশ স্থান-কাল-পাত্রের ওপর নির্ভর করে।

অনিয়ন্ত্রিত রাগের প্রকাশ ঘটে কী কী কারণে—

রাগের নির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই। এর কারণ অজস্র। অতিরিক্ত ক্রোমোজোম থাকলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাগ বেশি হতে পারে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, মানসিক ক্ষেত্রে হতাশার কারণেও রাগ বেশি হয়।

রাগ নিয়ন্ত্রণে আনবেন কী করে?

দেখতে হবে কোন রোগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে 'রাগ' দেখা দিচ্ছে। অর্থাৎ রাগেরও রোগের প্রকারভেদ অনুযায়ী ওষুধ দেওয়াটা চিকিৎসকের কাজ। সঙ্গে কাউন্সেলিং ভালো কাজ করে। এছাড়া হোমিওপ্যাথি ধাতুগত চিকিৎসা এই সমস্যার সমাধান করতে পারে।

বদরাগীর তকমা কপালে জোটার আগেই নিজেকে বদলে ফেলুন। সব সময় চেষ্টা করুন কিছু বিষয় মাথায় রাখতে।

আশা করা যায় এতে কিছুটা হলেও উপকার হবে—

● রাগের মাথায় কাউকে কিছু বলার আগে অবশ্যই একাধিকবার ভাবা দরকার। একবার বলে দিলে তা কিন্তু ফিরিয়ে আনার কোনো উপায় নেই। তাই অবশ্যই খেয়াল রাখুন কোথায়, কোন পরিস্থিতিতে কার সঙ্গে কথা বলছেন।

● যখন জানেন একটু পরেই মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, তখন মনের সমস্ত কথা কিছুক্ষণের জন্য মনেই রাখুন। পরে রাগ কমে এলে অপরপক্ষকে বুঝিয়ে বলুন তার কোন আচরণে আপনার অসুবিধে হচ্ছে বা আপনি কষ্ট পাচ্ছেন।

● জানি ব্যাপারটা একটু কষ্টের, তবে চেষ্টা করতে দোষ কী। ১০০ থেকে ব্যাক কাউন্ট করুন। দেখবেন শেষ হওয়ার আগেই আপনার রাগ কমে গিয়েছে।

● দুশ্চিন্তা কিন্তু রাগের একটা বড় কারণ। আর এই দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচতে নিয়মিত এক্সারসাইজ করুন। হাঁটা, জগিং, দৌড়, স্কিপিং, যোগাব্যায়াম— যেটা পছন্দ সেটা, দরকার পড়লে পছন্দের গান চালিয়ে নাচতেও পারেন।

● নিজেকে সময় দিন। রোজকার ব্যস্ত শিডিউল থেকে সময় বের করুন নিজের জন্য। যা একান্তই আপনার। আর এই সময় বই পড়া, গান শোনা অথবা পছন্দের ডিশ রান্না, যা খুশি করতে পারেন। অথবা কোনো ছুটির দিন একাকী বেরিয়ে পড়ুন। ঘুরে আসুন পছন্দের জায়গা থেকে।

● সমস্যা নয়, সমাধানের কথা ভাবুন। সমস্যা নিয়ে যত ভাববেন তত রাগ হবে।

● মনের কষ্ট চেপে না রেখে কারও সঙ্গে শেয়ার করুন। দেখবেন অনেকটা হালকা লাগছে। আর একান্তই কাউকে বলতে না পারলে ডায়েরিতে লিখে ফেলুন।

● রাগ পুষে রাখবেন না। কেউ আপনাকে রাগানোর চেষ্টা করলে পাত্তা দেবেন না। অফিসে বা বাড়িতে ভুল বোঝাবুঝি থাকলে মিটিয়ে নিন।

● মন খুলে হাসুন। এতে মনের ভার লাঘব হবে। মন খারাপ কমবে। রাগ করার সুযোগই পাবেন না। আর কখনও যদি দেখেন কেউ আপনাকে নিয়ে একটু বেশিই মজা করছে তখন আপনিও না হয় সেই হাসিঠাট্টায় যোগ দিন।

● রাতে ঠিক করে ঘুমোন। শুতে যাওয়ার আগে পরের দিনের কাজের চিন্তা না করে যতটা সম্ভব রিল্যাক্স করুন। ঘুম না আসলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

● একঘেয়ে জীবন থেকেও রাগ হয়। তাই ছুটি পেলে ঘুরতে চলে যান। অথবা বাড়িতে বন্ধুদের ডেকে নিন।

● এরপরেও রাগ না কমলে মনোবিদের পরামর্শ নিন। কোনো সংস্থা থেকে অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্টের কোর্সও করতে পারেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা এক্ষেত্রে ফলপ্রসূ।

যোগেশ্বর দত্তর অ্যাকাডেমিতে ভাষা এবং কুস্তি একসঙ্গে শিখবে খুদে পালোয়ানরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আর মাত্র কয়েকটা মাস। তারপরেই হরিয়ানার সোনেপতের নিকটবর্তী বালিগ্রামে দাপিয়ে বেড়াবে একদল খুদে পালোয়ান। তারা কুস্তির মারপ্যাঁচে যেমন পটু হয়ে উঠবে, ঠিক তেমনিভাবে মাতৃভাষা হরিয়ানভির মতোই কথা বলবে রাশিয়ান ভাষায়। লন্ডন অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী কুস্তিগির যোগেশ্বর দত্ত বালিগ্রামে এমনই এক অ্যাকাডেমি স্থাপন করেছেন যেখানে শিক্ষার্থীরা শুধু কুস্তিই শিখবে না, সেই সঙ্গে রাশিয়ান ভাষাটাও শিখবে।

অন্য রকম

কিন্তু হবু কুস্তিগিরদের হঠাৎ রাশিয়ান ভাষা শেখার দরকার পড়ল কেন? এর কারণ কুস্তিতে উন্নত পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের কোচ এবং খেলোয়াড়রা এই ভাষায় কথা বলেন। যোগেশ্বর দত্তের মতে ভাষাটি শিখে রাখলে ভারতের হবু কুস্তিগিরদের আখেরে লাভ হবে। তাঁর অ্যাকাডেমিতে এখন ৮০ জন আবাসিক শিক্ষার্থী রয়েছে। বয়েস মোটামুটি ১০-১৭ বছর। রাশিয়ান ভাষা জানা থাকলে আন্তর্জাতিক স্তরের কোচ ও প্রশিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলতে এদের সুবিধা হবে। যোগেশ্বর বলেন, 'আন্তর্জাতিক কুস্তিতে প্রথম সারিতে থাকা দেশগুলির বেশিরভাগেরই ভাষা হলো রাশিয়ান। ওরা আমাদের ভাষা বোঝে না। তাই আমরা যদি ওদের ভাষাটা শিখে নিতে পারি তাহলে ওদের নির্দেশ বুঝতে আমাদের কুস্তিগিরদের সুবিধা হবে।'

উল্লেখ্য, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যেসব দেশের জন্ম হয়েছে অর্থাৎ রাশিয়া, ইউক্রেন, জর্জিয়া, উজবেকিস্তান, আজারবাইজান, কাজাখস্তান এবং বেলারুশকেই আন্তর্জাতিক কুস্তিতে অগ্রগণ্য দেশ হিসেবে মানা হয়। এরা ছাড়া রয়েছে আমেরিকা, ইরান, বুলগেরিয়া এবং জাপান। রিও অলিম্পিকে কুস্তির জন্য নির্দিষ্ট ৭২টি পদকের মধ্যে ৩৫টি জিতেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে আসা দেশগুলির কুস্তিগিরেরা।

যোগেশ্বর দত্ত বলেন, 'কয়েকজন রাশিয়ান ভাষা শিক্ষকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। আমি তাদের এই অ্যাকাডেমিতে যোগ দেবার জন্য অনুরোধ করেছি। ছেলেরা যদি ভাষার বেসিকটাও শেখে তাহলেও অনেক উপকার হবে।' জুন মাস থেকেই অ্যাকাডেমিতে রাশিয়ান ভাষা শিক্ষার ক্লাস শুরু হয়ে যাবে। পাশাপাশি চলবে ইংরেজি শেখার ক্লাসও। যোগেশ্বর রাশিয়ান শেখার পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষাকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে চান। তিনি বলেন, 'আমরা, এই প্রজন্মের কুস্তিগিররা, কেউ ইংরেজি বলতে পারি না। এয়ারপোর্টে কাস্টমস অফিসারদের কথা মোটামুটি বুঝতে পারি। কারণ আমরা জানি ওরা কী জিজ্ঞাসা করবেন। কিন্তু এয়ারপোর্টের বাইরে যাওয়া মাত্র আমাদের অকূল পাথারে পড়তে হয়।'

আপাতত অ্যাকাডেমির শিক্ষার্থীদের বালির একটি কলেজে রাখা হয়েছে। পাঁচ বছরের জন্য কলেজটি লিজ নিয়েছেন যোগেশ্বর। কলেজে একটি আখড়া রয়েছে। আর আছে একটি ম্যাট। যার ওপর লড়াই করে কুস্তির আধুনিক দাওপেজ শেখে খুদে পালোয়ানরা। আরও তিনটি ম্যাট শীগগির এসে পড়বে বলে জানালেন যোগেশ্বর। আরও জানালেন, এখন যে ব্যবস্থা চলছে তা কিছুদিনের জন্য। যোগেশ্বরের গ্রামে একটি অত্যাধুনিক অ্যাকাডেমি নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। অ্যাকাডেমি তৈরি হয়ে গেলে সারা ভারত থেকে ছেলেমেয়েরা আসবে। অ্যাকাডেমির কথা বলার সময় যোগেশ্বরের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি নিজে জীবনে যা পাননি তা-ই ভবিষ্যত প্রজন্মকে দিতে চান। এই আত্মসর্বস্ব পৃথিবীতে এভাবে চাওয়াটাই যথেষ্ট কঠিন। এরপর সত্যিই যদি দিয়ে যেতে পারেন তা হলে তিনি যে আগামী প্রজন্মের বহু কুস্তিগিরের হৃদয়ে স্থান করে নেবেন, সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ■

টিভি সিরিয়ালে পুরাণ ও মহাকাব্যের জনপ্রিয়তা সব থেকে বেশি

স্বপন দাস

সালটা ছিল ১৯৮৬। রবিবারের সকাল। টানা একটি ঘণ্টা। রাস্তা-ঘাট, বাজার সব ফাঁকা। যেন একটা অঘোষিত বন্‌ধের চেহারা। খোলা জানলায় উঁকি মারা ভিড়। কী এমন ঘটনা যে এই অবস্থা? প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়নি, টেলিভিশনে যে রামায়ণ ধারাবাহিক চলছে তখন। মানুষ এই ধারাবাহিকের একটি মুহূর্তও ছাড়তে নারাজ। তখন একটাই মাত্র চ্যানেল— দূরদর্শন। আর সেখানে এই প্রথম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে এই ধারাবাহিক। কাছ থেকে, একেবারে কথা বলা ঈশ্বরের দর্শন। ধারাবাহিকটি শেষ হয়ে যাবার কুড়ি বছর বাদে একটি সাক্ষাৎকারে শ্রীরামের ভূমিকায় অভিনয় করা অরুণ গোভিল বলেছিলেন, 'আজও যেখানে যাই, মানুষ আমাকে রাম বলে প্রণাম করেন আর ফুলে মালায় ভরিয়ে দেন।' রামানন্দ সাগরের রামায়ণের পর ১৯৮৮ সালে এল মহাভারত। সেখানেও নীতীশ ভরদ্বাজের একই অবস্থা, শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষ করেছেন তার মধ্যে দিয়ে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বাণী এই মুহূর্তে না বললেই নয়। ঠাকুর বলছেন, 'থিয়েটারে লোকশিক্ষা হয়।' সেই লোকশিক্ষার বীজ লুকিয়ে আছে আমাদের বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, আর মহাকাব্যে। তাইতো রামায়ণ, মহাভারত সমেত সব আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় ধারাবাহিকের জনপ্রিয়তায় মাত্রা ছাড়া আবেগ দেখতে পাওয়া যায় আজও। এই আবেগকে পাথেয় করে নির্মিত হলো হনুমানকে নিয়ে কমপক্ষে দশটি ধারাবাহিক, শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে হলো পাঁচটি ধারাবাহিক, বিষ্ণু এলেন, রামও এলেন নানাভাবে আর এদের সঙ্গে এল বিক্রম আউর বেতালের মতো শিক্ষামূলক ধারাবাহিক। কৃষ্ণকেন্দ্রিক ধারাবাহিকগুলিতে বেদ যেমন এসেছিল, তেমনি সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছিল শ্রীমদ্‌ভগবত গীতার নানা বিষয়। সেদিন মহাকাব্য পড়ার অনুভূতিকে একটুও আঘাত না করে যে ছবি ওই ছোট পর্দায় আঁকা

হলো, তা আজও ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। আর ঠাকুরের লোকশিক্ষার সেই বাণীও প্রচারিত হলো সফল ভাবে।

আমাদের এই বাংলায় কিচেন পলিটিক্স বা ফ্যামিলি পলিটিক্স যাই বলুন না কেন, সেগুলি যে এখন মানুষ খুব একটা ভাল ভাবে নেয় না, তা রোজের মেগার দর্শককে জিজ্ঞেস করলেই উত্তর পাওয়া যাবে। তবু তো সেই চর্বিত চর্বণ গল্পের গোরুকে গাছে তুলে, সংসারের কুটকচালি নিয়েই তো মাসের পর মাস চলছে ধারাবাহিকগুলি। আর রুচিহীনতার চরমতম প্রকাশ আমাদের সমাজকে নানা ভাবে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত করছে।

এখন মানুষ আর কিচেন পলিটিক্স দেখতে চাইছে না। একটু রিলিফ চাইছে। আর সেই কারণে আবার গল্পে ফিরিয়ে আনতে হচ্ছে দেব-দেবীকে, নতুনভাবে ভাবনাচিন্তা করে মহাকাব্যের দিকে ঝুঁকতে হচ্ছে। ধর্মীয় মনোভাবকে যে ভাবেই হোক ধারাবাহিকের মধ্যে আনতে হচ্ছে নানা অছিলায়। আজও মানুষের কাছে যদি একটু ভাল ভাবে আমাদের ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাহিনিগুলোকে আনা যায়, সে নন প্রাইম টাইমে হলেও মানুষ দেখবেন আর হিট হবেই, এবং হচ্ছেও', বললেন সাধক বামাক্ষ্যাপা, শ্রীচৈতন্য, গুরুদক্ষিণা ধারাবাহিকের নির্মাতা সুব্রত রায়। একই মত ছদ্মবেশী, উড়ান ধারাবাহিকের নির্মাতা সুশান্ত দাসেরও।

একটা বিষয় হয়তো অনেকেই লক্ষ্য করেছেন বেশ কয়েকটি ধর্ম নির্ভর ধারাবাহিক বেশ জনপ্রিয় এখন। যেমন, শ্রীকৃষ্ণ, অগ্নিজল, শ্রীচৈতন্য, আবার সামাজিক ধারাবাহিকগুলিতে যখন বজরঙ্গবলী (খোকাবাবু), গণেশ দাদা (রাধা) এসেছে তখন সেগুলিও জনপ্রিয় হয়েছে।

নির্মাতারা জানিয়েছেন, অতীতে কেন আজও যদি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, সারদা মা, শ্রীচৈতন্য সমেত যে-কোনো ধর্মীয় চরিত্রকে নিয়ে ধারাবাহিক করলে মানুষ দেখবেনই। অতীতে এই বিষয়ের সব ধারাবাহিক খুব হিট। এখনও সেই সব ধারবাহিক আবার দেখালেও মানুষ দেখে।

মানুষ কিচেন পলিটিক্স দেখে ক্লান্ত। তাই দর্শকের ধর্মীয় ভাবাবেগকে সিরিয়ালে এনে বা ধর্মীয় সিরিয়াল তৈরি করে, দর্শককে আটকে রেখে, প্রায় কয়েক হাজার কোটি টাকার (প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার) বিজ্ঞাপন বাজারের বাণিজ্যিক সফলতার দিকে আবার হাঁটতে চলেছে মেগা ধারাবাহিকের নির্মাতারা। কিন্তু বাধ সেধেছে অধিক নির্মাণ খরচ। কেননা ধর্মীয় ধারাবাহিকের জন্য সেট, পোশাক-আশাক ও নির্মাণ খুব খরচ সাপেক্ষ, তবুও কিছু নির্মাতা তৈরি করছেন। ▪

গিটারভূত

আর মাত্র পাঁচ মাস হাতে সময়। আমাদের স্কুলে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গেলে

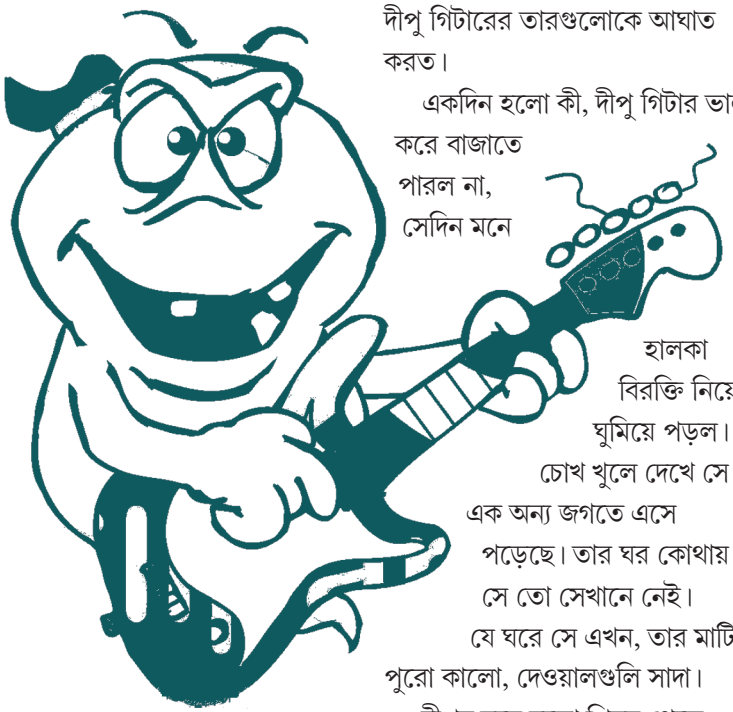

দলগত ভাবে নিতে হবে। দলে থাকবে একজন গায়ক, একজন গায়িকা, আর চারজন বাজনদার।

আমাদের এই আন্তঃস্কুল সঙ্গীত প্রতিযোগিতা নিয়ে সবাই খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। আমাদের দলের মধ্যে ছিল দীপু। তার গানের গলা শুনে গানের স্যার বলেই দিয়েছিলেন, ওর দ্বারা গান হবে না। তাহলে দীপু কী করবে? দীপু এবার গেল গিটার শিখতে। একটা নতুন গিটার কিনল। দীপু গিটার বাজাতে খুব ভালবাসত। কিন্তু ওর চরিত্রে একটা বদগুণ ছিল। সামান্য বিরক্তি এলেই নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারত না। আর এটা দেখা যেত যখন একটা কাজ একবারে করতে পারছে না তখন। এই বিরক্তির অভ্যাস দীপু গিটার শিখতে বা বাজাতে গিয়েও ছাড়ল না। তার সব থেকে প্রিয় এই গিটার বাজাবার সময় যদি সামান্য ভুল করত, খুব বিরক্ত হয়ে দীপু গিটারের তারগুলোকে আঘাত করত।

একদিন হলো কী, দীপু গিটার ভাল করে বাজাতে পারল না, সেদিন মনে হালকা বিরক্তি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। চোখ খুলে দেখে সে এক অন্য জগতে এসে পড়েছে। তার ঘর কোথায়? সে তো সেখানে নেই। যে ঘরে সে এখন, তার মাটিটা পুরো কালো, দেওয়ালগুলি সাদা।

দীপুর মনে হলো পিছন থেকে কেউ যেন ডাকছে। পিছন ফিরে তাকায় দীপু। একটা অদ্ভুত জিনিস দেখে তাজ্জব হয়, যার নীচের দিকটা ছিল খুব মোটা, আর ওপরের দিক্‌টা খুব একটা মোটা নয়। এর ওপরেই দু'দিকে তিনটে করে তার লাগানো। সেই অদ্ভুত দর্শন জিনিসটার বড় বড় ডেবা-ডেবা চোখ।

দীপু জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কে?'

সে রেগে বলে, 'আমাকে এখনও চিনতে পারলে না। আমি তোমার কালো গিটারের ভূত।

দীপু আবার বলে, 'তুমি এখানে কী করছ?'

গিটারভূত বলল, 'আমি তোমার জন্যই এসেছি, তুমি বলতে তুমি আমাকে এত জোরে জোরে আঘাত কর কেন? আমার যে খুব লাগে।'

দীপু বলে, 'আমার কী দোষ, তুমিই খারাপ।'

গিটার ভূত বলে, 'খারাপ আমি নই, খারাপ তোমার মাথা। তুমি জানো, তোমার ওই বিরক্তির জন্য তারে আঘাত করতে আমার কত লাগে?' গিটারভুতের চোখগুলো লাল হয়ে ওঠে। 'দ্যাখ এবার মজা', এই বলেই গিটারভূত, নিজের সরু হাত দিয়ে টেনে দীপুকে নিয়ে আসে নিজের কাছে। দীপু আর নড়তে পারছে না। দীপু অনুভব করে, সে গিটার হয়ে গেছে। আর গিটার হয়ে গেছে দীপু।

দীপু হয়ে যাওয়া গিটার গিটার-দীপুকে জোরে জোরে আঘাত করতে থাকে। দীপু চিৎকার করতে থাকে, 'আঃ আঃ লাগছে, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করে দাও, আর কোনোদিন এমন করব না।'

একটা তালির শব্দ শোনে দীপু। আবার সব আগের মতো। গিটার ভূত দীপুকে বলে, 'বুঝলে বিরক্ত হওয়ার ফল? বিরক্ত হলে কোনোদিন কোনো কাজ ভালো করে হবে না। সেই কাজ আরও কঠিন হয়ে যাবে তোমার কাছে। মিলিয়ে নিও।'

দীপুর ঘুম ভেঙে যায়। সে তাড়াতাড়ি এক ছুটে গিটারের কাছে গিয়ে এক অদ্ভুত ভঙ্গিমায় তাকিয়ে রইল। চোখের পাতা আর পড়ে না দীপুর। সে প্রতিজ্ঞা করল নিজের স্বপ্ন থেকে যে শিক্ষা পেল, তা সে জীবনে আর কোনোদিন ভুলবে না।

মৌনব দাস

ভারতের পথে পথে

খাজুরাহোর মন্দির

মধ্যপ্রদেশের ছত্তরপুর জেলায় খাজুরাহো। ছত্তরপুরের ৪৩ কিলোমিটার পূর্বে শিবসাগর ঝিলের পাশে ৮৫টি প্রাচীন মন্দির ছিল। এখন ২০টি রয়েছে। এখানকার প্রধান মন্দির ৩টি। (১) চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির। এর উঠোন ১০৪×৬০ ফুট। চারপাশে ৬৫টি ঘর ছিল। এখন ৩৫টি রয়েছে। নবম শতাব্দীতে তৈরি। (২) কঙ্কড়িয়া মহাদেব। এর প্রবেশদ্বার অতীব সুন্দর। গর্ভগৃহে হিমশীতল শ্বেত শিবলিঙ্গ রয়েছে। মন্দিরে সর্বোচ্চশিখরে অমৃতকলস রয়েছে যা দূর থেকে দেখা যায়। (৩) লক্ষ্মণ মন্দির। এর নির্মাণশৈলী ভারতের কোনো মন্দিরে দেখা যায় না। এছাড়া মাতঙ্গেশ্বর মহাদেব মন্দির, হনুমান মন্দির, জওয়ান মন্দির এবং দুলাদেব মন্দির আকর্ষণীয়।

এসো সংস্কৃত শিখি

তিষ্ঠতু ভো:, অর্ধার্ধ চায়ং পিবাম:।

একটু দাঁড়াও, আধাআধি চা হয়ে যাক।

অস্তু, পিবাম:।

ঠিক আছে, হয়ে যাক।

স্থাতুং সময়: এব নাস্তি।

দাঁড়ানোর সময়ই নাই।

গমনাত্ অনুক্ষণমেব পত্রং লিখতু।

পৌঁছেই চিঠি লিখো কিন্তু।

পুন: কদাচিত্ মেলিষ্যামি।

আবার কখনও দেখা হবে।

ভালো কথা

ভালো কাজ

আমার ঠাকুর্দার ৯২ বছর বয়স। খুব রাশভারী মানুষ। পাড়ার সবাই শ্রদ্ধা করে ভয় করে। আমার সঙ্গে দাদুর খুব ভাব। আমি ও দাদু সকাল সন্ধ্যে হাঁটতে বেরুই। এখন বন্ধ। ২ মাস আগে একদিন হাঁটতে বেরিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ায় মা বাইরে বেরুতে বারণ করে দিয়েছে। মা'কে দাদু খুব ভয় করে। বলে— তোর মা যে আমারও মা। বাবাও দাদুকে খুব ভয় করে। বাবা তো মার্চেন্ট নেভিতে চাকরি করে। দু'তিন বছরে একবার বাড়িতে আসে। সেদিন মা বাজার করতে বেরিয়েছে। আমি পাশের বাড়ি রুমাদির কাছে পড়তে গেছি। দাদু সেই ফাঁকে বাইরে হাঁটতে বেরিয়ে আবার মাথা ঘুরে রাস্তায় পড়ে গিয়েছে। পাড়ার কাল্টু, ঘোত্না, তিনকড়ি দাদুকে রাস্তা থেকে বাড়িতে দিয়ে গেছে। মা ওদের বখাটে ছেলে বলে। দু'চক্ষে দেখতে পারে না। মা বাড়ি ফিরে সব শুনে দাদুকে আবার শাসন করে। তারপর বাবনদাকে দিয়ে বখাটে ছেলেগুলোকে বাড়িতে ডেকে মিষ্টি খাইয়ে সেকি প্রশংসা!

প্রীতম চ্যাটার্জী, একাদশ শ্রেণী, দেবীনগর, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

বৃষ্টি

তিথি সরকার, একাদশ শ্রেণী, তপন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

অবশেষে বৃষ্টি এল
ধরিত্রীটা শান্ত হলো,
গুমোট গরম উধাও হলো
মানুষজন শান্তি পেল।
বর্ষার ফুল ফুটল কত
বেল মালতী শত শত,
গাছ ভর্তি কদমফুল
গন্ধে শুধু করে আকুল।

ভরে গেছে খালবিল
মাছের লোভে উড়ছে চিল,
বাঁশের বনে রাত্রিবেলা
গ্যাংগর গ্যাংগর ব্যাঙের মেলা।
বৃষ্টি হলো উধাও গরম
মনটা এখন সবার নরম,
বর্ষাকাল যে প্রাণের সৃষ্টি
সবার প্রিয় তাইতো বৃষ্টি।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

Krishna Chandra Dutta (Cookme) Pvt. Ltd.

কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্মী)
প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন

Pure Indian Spices

fssai
Lic. No.
12812019005087

রেজিস্টার্ড অফিস ঃ ২০৭ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কোলকাতা ৭০০০০৭
দূরভাষ ঃ (০৩৩) ২২৫৯ ০৮৬৩/১৭৯৬/৪১১২/৫৫৪৮
email : dutaspice@gmail.com
website : www.dutaspices.com

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
19 June - 2017 - Rs. 10.00,

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০ টাকা ।।